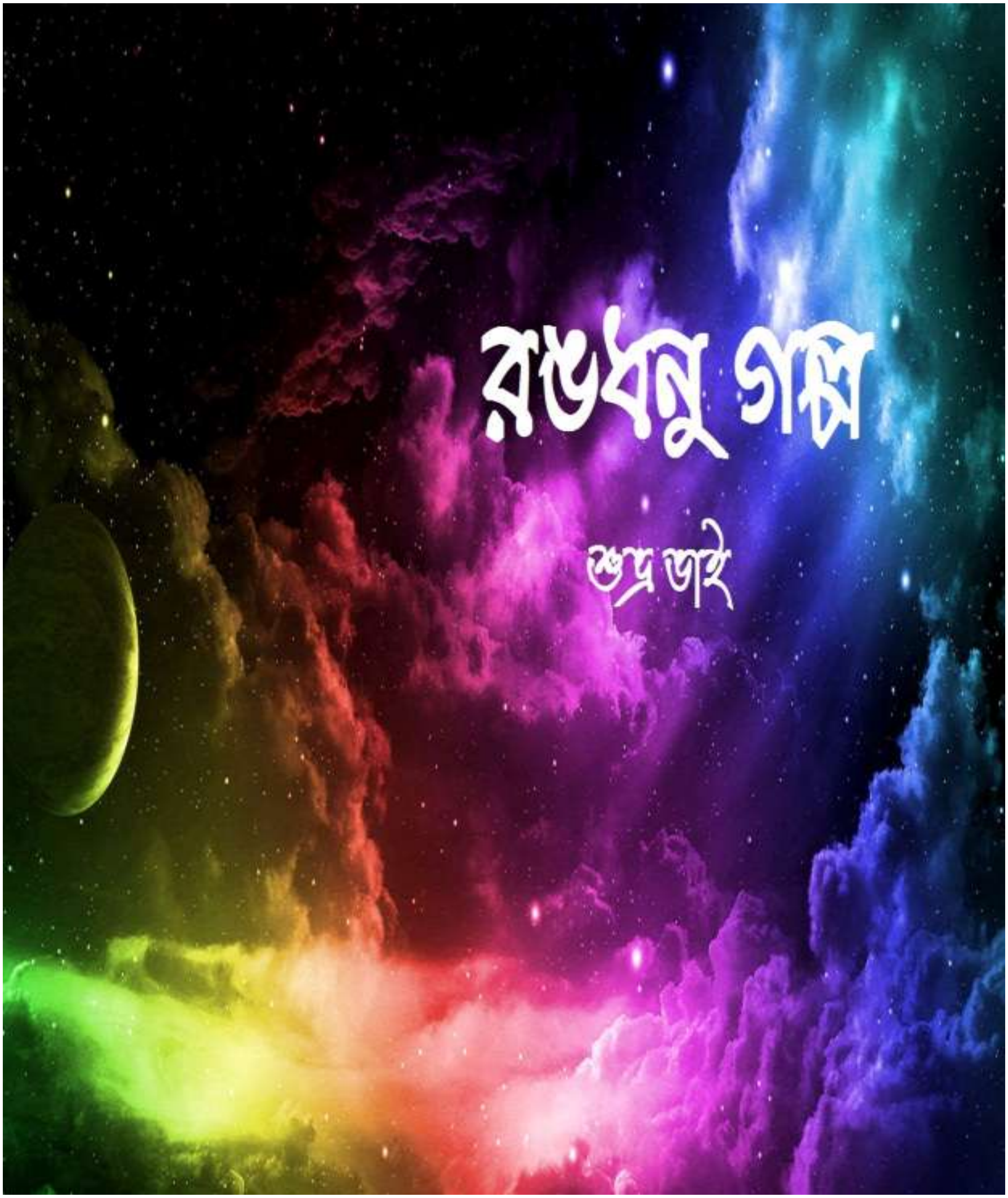
রঙধনু গল্প
শুভ্র ভাই

সূচীপত্র

১ । কন্ডোমের ছেঁড়া প্যাকেট ৩

২। দ্যা হাজব্যান্ডস ৭

৩ । প্রথম প্রেম ১১

৪ । বৈরী বসন্তে ১৫

৫ । ফেইক আইডি ২৪

৬ । ক্রাশ ৩২

৭ । নিরুদ্দেশে ৪০

৮ । পথের বাঁকে ৪৬

৯ । বাবা ৫১

১০ । ভালো লাগা উপাখ্যান ৫৭

১১ । দুর্বলা ৬১

কন্ডোমের ছেড়া প্যাকেট

শেষ বিকেলের রোদের ছায়া বিছিয়ে আছে পিচ ঢালা কালো রাস্তার উপর্। টুংটাং ঘন্টা বাজিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে কুলফি ওয়ালা। রাস্তার ফুটপাত ধরে পায়চারি করছে সুদর্শন এক কিশোর্। বয়স চৌদ্দ পনেরোর মত হবে। গায়ের রঙ পাকা আঙুরের মত । হলুদাভ আভা মন ছুঁয়ে যায়। টানা টানা দুই চোখে অদ্ভুত এক কামুক আহবান। চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে আমি ছেলেটাকে দেখছিলাম। দেখছিলাম না বলে রুপ সুধা গিলছিলাম বললেই ভালো হবে। চলার পথে অচেনা মানুষের রুপ দেখা আমার বহু পুরাতন অভ্যেষ। কারো চোখ, কারো ঠোঁট, কারো কোমরের গঠন মনে সুড়সুড়ি জাগিয়ে যায়। ছেলেটার মধ্যে, " আমাকে সবাই চায়, " টাইপের একটা ভাব আছে। তার ভাব দেখে আপন মনেই হাসছি।

সাদা একটা টয়োটা এসে থামলো। ছেলেটা হাসিমুখে এগিয়ে গেলো। মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক বসা ড্রাইভারের সিটে। হাত বাড়িয়ে তিনি দরজা খুলে দিলেন। ছেলেটা একটু মেয়েলি ভঙ্গিতে হেঁটে গাড়িতে উঠে বসলো।আমার সামনের রাস্তায় পড়ে থাকা কিছু শুকনো পাতা উড়িয়ে গাড়িটি সামনের মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বসন্ত বিকেলে মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। দোকানের রেডিওতে কি একটা গান বাজছে। শিল্পী খুব সম্ভবত এস ডি বর্মন। মনে পড়ে রুবি রায়, কবিতায় তোমাকে কত যে ডেকেছি গানটায় এক কিশোরের অব্যক্ত ভালোলাগা ফুটে ওঠে প্রতিটি কলিতে। আমার এই ভালোলাগাও কি সেই ভালোলাগার মত। দোকানে আমরা দুজন। আমি এবং চা দোকানী লিটু ভাই। অনেক দিন চা খাওয়ার ফলে লিটু ভাইয়ের সাথে বেশ আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমকামী হওয়ার দরুন অন্য মানুষের চোখ দেখে সহজে বুঝতে পারি সে সমকামী কি না! লিটু ভাইয়ের চোখে অন্যরকম

এক উদাসীনতা থাকে সব সময়। তবু আমি বুঝতে পেরেছি লিটু ভাই সমকামী ছিলেন। মাঝে মাঝে টুকটাক কথা হয়। ছেলেটাকে দেখে বলল,

- কত জনের সাথে যে গেলো এই পোলা!

- চেন নাকি তারে ?

- চেহারায় চেনা। প্রায়ই নিত্য নতুন লোকের সাথে গাড়িতে করে চলে যায়।

- পার্ট টাইম কাজ টাজ করে নাকি ?

- পার্ট টাইম দেহ বেঁচা কাজ করে বলে মনে হয়।

- আচ্ছা লিটু ভাই , তুমি সমকামী জগৎ থেকে কিভাবে বের হয়ে গেলে ?

- সে এক লম্বা কাহিনী।

- বলা যায় ?

- হুম। বলা যায়। আর কিছু না হোক জীবনে কিছু শিখতে পারবে আমার কাছ থেকে।

- বলো।

- আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। দুই বোনের পর আমি একমাত্র ছেলে হওয়ায় অনেক যত্নে মানুষ হই। তখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি । বড় দুলা ভাইয়ের ছোট ভাই নাসির বেয়াই আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। রাতে এক সাথে ঘুমাতে হলো আমাদের দুজনকে। সেদিন রাতে হঠাৎ বৃষ্টি এলো। কাঁথা ছিলো না। ঠান্ডায় কুকড়ে শুয়ে রইলাম। নাসির বেয়াই আমাকে জড়িয়ে ধরে। আমার বেশ আরাম লাগে। এক পর্যায়ে নাসির বেয়াই আমার সাথে সেক্স করে। সত্যি বলতে কি অনেক ব্যাথা লেগেছিলো। কিন্তু আমি বাঁধা দেইনি। পরের রাতে আমরা দুজন আবার মিলিত হয়।

এভাবে কয়েক দিন হওয়ার পর নাসির বেয়াই চলে যায়। আমি নিজের ভিতর অন্যরকম এক শূন্যতা বোধ করতাম।

কলেজে পড়ার সময় আমি পুরোপুরি সমকামী দুনিয়ার রাস্তা চিনে যাই। বেশ ডাগর চেহারা ছিলো আমার্। সবাই পছন্দ করত। বাপের বয়সী বুইড়া খাটাস গুলা টাকা দিয়ে সেক্স করত। হাত খরচের টাকা পেতাম। আমিও প্রতিদিন কারো না কারো সাথে চলে যেতাম। বড়লোকের বিশাল বাঙলো বাড়িতে কিংবা হোটেলের অন্ধকার ঘরে পরপুরুষের হাতে নিজেকে সঁপে দিতাম। চিপে চুষে সবাই শেষ টাকাটি উসুল করা পর্যন্ত আমাকে ভোগ করত। পাপ তাপ এসব নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। নিজে যে প্রস্টিটিউট হয়ে গেছি সেটকুও বুঝতাম না। চোখে রঙিন চশমা। দুহাতে টাকা ওড়াতাম প্রচুর ।

আগেই বলেছি যে যেভাবে খুশী আমাকে ভোগ করত। আমি বাঁধা দিতাম না। একবার শুধু বাঁধা দিয়েছিলাম। দুজন বিশাল দেহী যখন এক সাথে পুশ করার চেষ্টা করেছিলো। খদ্দেরদের অধিকাংশই সেক্স করার সময়ে কন্ডোম ব্যবহার করতে চাইত না। তাদের ধারণা কন্ডোম পরলে মজা কমে যায়। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। তখন এগুলো বুঝিনি। বোঝার চেষ্টাও করতাম না।

একটা সময় শরীরের মাঝে কিছু পরিবর্তন হতে লাগলো। আমি কি করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। নিত্য নতুন লোকের সাথে সেক্স করতাম। তোমাদের এখন যেমন দেখি দু চারজন বন্ধু থাকে আমার সেরকম কেউ ছিলো না। হাজার পুরুষের সামনে কাপড় খুলেছি। এমনও হয়েছে যে একজন আমাকে করছে আর অন্যরা চেয়ে দেখছে। তখনও লজ্জা পাইনি। কিন্তু লজ্জা পেতাম ডাক্তারের কাছে এগুলো বলতে। ডাক্তারের কাছে বলতাম অনেক কিছু লুকিয়ে চুরিয়ে। ডাক্তার রোগ ধরতে পারত না। ভুল ওষুধ দিত। আমি ডাক্তারকে দোষ দেই না।

একটা সময় শরীর ভাঙতে শুরু করলো। আপেলের মত ফোলা গাল চুপসে আমসি হয়ে গেলো। যৌন রোগের শিকার হলাম। একি এভাবে তাকাচ্ছো কেন ! এইডসের কথা ভাবছো? না। এইডস না। এইডস ছাড়াও অনেক রোগ আছে। সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদি।

আইয়ে পাশ করেছিলাম শেষ পর্যন্ত। অনেক চেষ্টা তদবির করে রোগ সারলো কিন্তু শরীর আর সারলো না। দুর্বল লাগে। বুক ধুকপুক করে। অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যাই। আমাকে আর কেউ গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যায় না। আব্বা আম্মার সঞ্চয় অনেকটা খরচ হয়ে গেছে আমার পেছনে। বাড়ি খানা ছাড়া আর কিছু নেই।

- ইন্টার পাশে তো চাকরি বাকরি কিছু একটা জোগাড় করতে পারতে ? চায়ের দোকান দিলে কেন ?

- চাকরি। হুম। চাকরি একটা জোগাড় করেছিলাম। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য করতে পারিনি সেটা। আব্বা মারা গেলো। একটা কিছু তো করা লাগত। নাসির বেয়াই এই দোকানটা করে দিয়েছে ।

- নাসির , তিনি কি করেন।

- নাসির বেয়াই এখন অনেক টাকা পয়সার মালিক। অনেক দুর লেখা পড়া করে বড় চাকরি পায়। গাড়ি বাড়ি করেছে সে। ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখে আছে। কলেজে পড়ার সময়ে নাসির বেয়াই অনেকবার আমার পিছে ঘুরেছে। আমি তখন তাকে পাত্তা দেই নি। অথচ আজ তার দয়ায় আমার দুইবেলা খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। জীবন এরকমই। কাল কি হবে তা আমরা কেউ বলতে পারি না। তাই অনিরাপদ সেক্স করে ভুল করবা না।

সন্ধ্যার চাদরে মুড়ে যাচ্ছে প্রকৃতি। সামনের গলি থেকে একটা কুকুর ছুটে এলো। আমাদের পাশ কাটিয়ে সে দৌড়ে চলে গেলো। এবার উঠতে হবে। ঘরের পথ ধরলাম। দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালো সেই গাড়ি । কিশোর ছেলেটা নেমে চলে গেলো। মধ্য বয়স্ক লোকটা গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, মামা চা হবে ? লিটু ভাই চা বানাচ্ছে এক মনে। চেহারায় সেই উদাস ভাব। বসে যাওয়া ফর্সা গালে কেটলির ভাপ লাগছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। হেড ফোন লাগিয়ে নিলাম কানে। কানের ছিদ্র দিয়ে মাথার ভেতর কিছু গান ঢোকানো যাক।

ফরিদা পারভীন গেয়ে উঠলো লালন গীতি,

দিন থাকতে দিনের মর্ম কেন বুঝলে না, সময় গেলে সাধন হবে না।

দ্যা হাজব্যান্ডস

চুরি করে যে বেশ্যার ভাত খায়, তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয় ...

- বাউল সম্রাট লালন শাহ ।

বাতাসে ছিলো সাগরের গর্জন । শংখ ধ্বনির মত কানের কোটরে এসে বাতাসেরা একটানা শিষ দিয়ে চলেছে। ছোট ছোট ঢেউগুলো অবিরাম তীরের দিকে ছুটে আসছে অজানা কোন আকর্ষণে। বালির উপর আছড়ে পড়ে আবার পেছন পানে ছুটে চলছে । এই ছুটে চলা নিরন্তর্। আকাশে মেঘের নিচে কয়েকটি গাংচিল উড়ে বেড়াচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ছিলো ধ্রুব। ধ্রুব কক্স বাজারের

ছেলে। গ্রামের বাড়ি টেকনাফের ওদিকে। সাগর তীরে সে মাঝে মাঝে আসেই। সাগর তাকে সবসময় টানে। সাগরের বালুতে পা ডুবিয়ে বসে থাকলে সে যেন প্রাণ ফিরে পায়।

ধ্রুব রুপালী ব্যাংকে চাকুরি করে। মাঝারি উচ্চতার মানুষ। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। গায়ের রঙ ফরসা , গোলগাল গুল্টু গুল্টু চেহারা। তবে যে জিনিসটা দিয়ে তাকে সহজে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায় তা হচ্ছে তার টানা টানা কাজল কালো চোখ। চোখের দিকে তাকালে তোমার মনে কেমন যেন একটা মায়া জন্মে যাবে। তুমি টেরই পাবেনা। ব্যাংকাররা সাধারনত কম কথা বলে। ধ্রুব আরও কম কথা বলে। বিয়ে করেছে বছর পেরিয়ে দুই বছর হতে চললো। এখনো বাচ্চা কাচ্চা নেয়নি । ছাতার নিচে চেয়ারে শরীর বিছিয়ে শুয়ে আছে সে। দূরে কোন ফল বিক্রেতার সাউন্ড বক্সে বাজছে সাঁইজির বিখ্যাত গান , জাত গেলো জাত গেলো বলে একি আজব কারখানা। বাম হাত খানা চোখের সীমানায় উঁচু করে ধরে সে রিস্ট ওয়াচে সময় দেখে।

আবিরকে আসতে দেখা যাচ্ছে।পরনে হাফপ্যান্ট । বোতাম খোলা হাওয়াই শার্ট বাতাসে উড়ছে। আবিরের শারীরিক গঠন চমৎকার্। তার উপর নিয়মিত জিম করার মাসল হয়েছে দেখার মত। আর সেটা দেখানোর জন্য সুযোগ পেলেই আবির দেহ বাড়ির সদর দরজা খুলে রাখে হাট করে। সি বিচে আবিরের আসার কথা বিকেল পাঁচটায়। সাহেব আসছেন এখন ছয়টার সময়। আবিরকে আজ আচ্ছামত বকা দেবে বলে ঠিক করলো ধ্রুব। কিন্তু ধ্রুব ভালো ছেলে। কাউকে বকা ঝকা সে করতে পারে না। সি বিচের এই চেয়ার গুলোর ভাড়া আগে ঘন্টাপ্রতি ৩০ টাকা ছিলো। আজ চাচ্ছে ৫০ টাকা। যে হারে জিনিস পত্রের দাম বাড়ছে সে হারে বেতন তো আর বাড়ে না। আবির মৃদুমন্দ ছন্দে হেঁটে আসছে। আবির ধ্রুবর কাছে এস আশপাশের মানুষকে সচকিত করে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, “হোয়্যাটস আপ ম্যান”।

ধ্রুব উঠে বন্ধুকে জাপটে ধরলো। এখনো বাংলার মানুষ বন্ধুকে বুকের সাথে জাপটে ধরলে অন্য কিছু মিন করে না। ধ্রুবের কথায় কক্সবাজারের আঞ্চলিক টান।

-ভাল আছি। এই তোমার আসার সময় হলো?

- আরো আগেই বেরোতে চেয়েছিলাম ডারলিং। কিন্তু আসার আগের মুহূর্তেই এক ক্লায়েন্ট এসে হাজির। গাড়িতে তার বকর বকর শুনতেই এলাম। তাকে নামিয়ে দিয়ে তবে এলাম।

- গুল মারো মিয়া। এই ড্রেসে তুমি অফিসে গেছিলা।

- মাইরি বলছি বস। আর তুমি তো জানো আমার গাড়িতে রাখা সুটকেসে কিছু কাপড় রাখাই থাকে। বাপ শালা দিন দিন শুধু টাইট দিতাছে। একটু মন খুলে মজা করবো তার সুখ নেই। তাও রক্ষে বউ দারোগা বাপের বাড়ী আছে।

আবিরের বাবার গোটা পাঁচেক ইন্ডাস্ট্রি আছে। বাবার অফিসে বসে সে। বয়স ধ্রুবর কাছাকাছি। আঠাশ , সাড়ে আঠাশ। গত বছর বাউন্ডুলে ছেলেকে ঘরমুখো করতে প্রায় জোর করে আবিরের মা তাকে বিয়ে দিয়েছে। কাজের কাজ আবির করেছে একটা। বছর ঘোরার আগেই বউ প্রেগন্যান্ট, এখন বাবার বাড়ি রাউজানে আছে। বউটা আবিরকে সারাক্ষণ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে। ঘড়ি ঘড়ি ফোন না করলে যেন তার পেটের ভাত হজম হয় না। সেদিক থেকে ধ্রুব বেশ লাকি। তার ওয়াইফ একটা স্কুলে পড়াই। নিজে বেশ ব্যস্ত থাকে। তাই ধ্রুবকে সেভাবে খবরদারীর ঝক্কি সামলাতে হয় না।

আবির আর ধ্রুব এক শহরের মানুষ হলেও তারা পরস্পরকে চিনতে পেরেছে ফেসবুকের কল্যাণে। শরীরের তাগিদেই তারা দুজন দুজনকে খুঁজে নিয়েছে। তা বছর চারেক হবে। প্রথম দিকে কিছুটা দুরত্ব তৈরী হয়েছিলো। কিন্তু কর্মজীবনে ঢোকার পরে তারা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে নতুন ফুলের মধু খোঁজার সময় পায় না। কখন যে একে অন্যের পরিপুরক হয়ে উঠেছে তা তারা

দুজনের কেউই টের পায় নাই। ইদানিং যে সমপ্রেম বলে একটা কথা প্রচলনের চেষ্টা করছে কিছু বাঙালি সমকামী সেই প্রেম ট্রেম তাদের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না । সপ্তাহ শেষের দিনটি তাদের কামনার রঙে রঙিন হতে লাগলো । গভীর রাতে কখনো আবিরের মার্সিডিজের সিটে, ধ্রুবর ফ্লাটে আবার কখনো বা নির্জন সমুদ্র তীরে তাদের দুটি শরীর এক হয়ে যেতে থাকলো। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সাগর তীরের বালুতে আদিম রোমান্সে মেতে ওঠা তাদের কাছে নেশার মত। একবার এক রাতে আরেকটু হলে তো তারা ধরাই পড়ে যেত। বিয়ের আগ পর্যন্ত ভালোই চলছিলো। বিয়ের পরে তারা আর এত সহজে মিলিত হতে পারত না। সন্ধ্যা রাত বৌয়ের জিম্মায় হাওলা করে দিতে হয়েছে।

একটু একটু করে দিনের সূর্য্য সাগরের জলে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। চেয়ারে পাশাপাশি শুয়ে দুজন সুর্যাস্ত দেখতে লাগলো। সাগরপাড়ে মানুষের ভীড় লেগেই থাকে। তাও ভালো দুজন ছেলেকে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে দেখলে এদেশের মানুষ এখনো বন্ধুত্ব ভাবে। ইউরোপ আমেরিকা হলে ভিন্ন চোখে দেখত। দূর থেকে কেউ কেউ অনুচ্চ স্বরে ফ্যাগট বলে বিরক্তি প্রকাশ করত। ধ্রুব মানুষের চোখ এড়িয়ে আবিরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। আবির জিজ্ঞেস করলো ,

- বউ কোথায় ?

- স্কুল ছুটি। বাবার বাড়ি গেছে গতকাল।

- তাহলে আজ আমার বাসায় যাচ্ছো?

- বাসায় বলে আসিনি।

- ফোন করে বলে দাও। অনেক দিন কিন্তু সেভাবে মজা করে মাস্তি করা হয় না। এভাবে পুতু পুতু করে পাঁচ মিনিটে কাজ সারতে আমার ভালো লাগে না।

- ওকে ডিয়ার। বলে দেবো। চল আজ বাইরে ডিনার করি।

- হুম। করা যায়। কোথায় খাবে আজ ?

- আজ আমি খাওয়াবো। রাখাইন মার্কেট থেকে কিছু দূরে এগিয়ে গেলে একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে। একদিন এক কলিগের সাথে লাঞ্চ করেছিলাম। ওদের রুপচাঁদা ফ্রাই টা জোশ লেগেছিলো। ওখানেই যাই চলো।

- রুপচাঁদা ফ্রাই। ইয়াম্মি। সাথে কিন্তু লইট্যা শুটকির ভর্তা নিতে হবে।

- অবশ্যই।

- আজকাল কলিগদেরকে সময় দিচ্ছো নাকি!

- আবার পুরোনো ইয়ার্কি শুরু করলে!

- স্যরি মাই ডিয়ার। এই তোমার কান ধরছি।

- ওকে বাবা। এখনি যাবে।

- কি বলো। মাত্র সাতটা বাজে। প্রথম ডোজটা না হয় ঝাউবনে হোক। আর দেরী সহ্য হচ্ছে না।

- ধ্যুর । এগুলা কি বলো। চারি দিকে মানুষ গিজ গিজ করছে। তোমার কিন্তু সাহস বেড়ে যাচ্ছে। ধরা পড়লে পত্রিকায় ছবি ছাপিয়ে দেবে। সাংবাদিকগুলার আজকাল খেয়ে দেয়ে কোন কাম কাজ নেই। কেউ ঠুস করে পাদ দিলে সেটা নিয়েও দেখবা নিউজ ছাপবে।

- আরে গিয়েই দেখি না। কোন কিছুতে থ্রিল না থাকলে মজা কিসের। আপত্তি আছে ?

- নাহ। আপত্তি কিসের। চলো যাওয়া যাক।

দুজন হাত ধরাধরি করে এগিয়ে যেতে লাগলো। বালির উপর তাদের পায়ের চিহ্নের কালো কালো ছোপ পড়তে লাগলো। বাতাস তখনো শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে চলেছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত সাগরের উপর্। ছোট ছোট ঢেউয়েরা ছুটে আসছে বেলাভূমে। সাঁইজির গান থেমে গেছে। কিন্তু তার রেশটুকু রয়ে গেছে ওই ঝাউবনের চাঁদের আলো ফাঁকি দেয়া আঁধারের গহবরে। যেখানে একটি দেহ আরেকটি দেহের মাঝে সমাজ নিষিদ্ধ এক বন্ধনে মিলিত হচ্ছে। যেখানে লালারসে মিশবে লালারস, ঘন হয়ে আসবে নিঃশ্বাস। একটি দেহের সাথে আরেকটি দেহ সাপের মত জড়াজড়ি করে ধরবে। ঘামে ভিজে পুরো শরীর। শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে রক্তপ্রবাহ বেড়ে যাবে। উত্তাপে কামনায় অধীর হয়ে উঠবে দুজন।

চুরি করে যে বেশ্যার ভাত খায়, তাতে ধর্মের কি ক্ষতি হয়, সবই দেখি তা না, না না।

প্রথম প্রেম

মুহিবুল হাসান খোকন। বছর বাইশের এক তাগড়া যুবক। ইদানিং বাসায় ফিরেন কম্পিউটারে বসা তার একটা নেশার মত হয়ে গেছে। কি এক অজানা আকর্ষণ তাকে চুম্বকের মত টানে। খোকনের গ্রামের বাড়ি যশোরের মনিরামপুরে। কপোতাক্ষ নদের তীরে খেলা করে কেটেছে বাল্যকাল। কৈশোরের দিন গুলো তার জন্য খুব সুখময় ছিলো না। বাবা মাকে হারিয়ে জীবনের কঠিন পাশটা সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে কাঁচা বয়সেই। আবেগ টাবেগকে সে প্রথম দিকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি কখনো। যৌবনের শুরুতে জীবিকার তাগিদে সে যশোর থেকে পাড়ি জমায় ইট পাথরে মোড়া এই ঢাকা শহরে। যশোর রেল স্টেশান থেকে শুরু হওয়া জার্নি বাই ট্রেন শেষ হয় কমলাপুরের প্লাটফর্মে। শুরুর দিন গুলো কি কঠিনই না ছিলো। ক্ষুধায় পেট মোচড় দিয়ে ওঠে। পকেটের অবস্থা সংগীন। খাবারের দোকান গুলোতে বাহারি খাবার থরে থরে। সাজিয়ে রাখা।

খাবারের ঘ্রাণ বাতাসে চড়ে ধাক্কা খায় নাকের বারান্দায়। আর সেই ধাক্কার রেশ গিয়ে পৌঁছায় মস্তিষ্কে। ক্ষুধাটা তখন চাগিয়ে উঠে। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সরে যেতে হয়েছে। কত বেলা যে অভুক্ত কেটে যেত তার খোঁজ কেউ রাখে নাই। রাখার সময়ও ছিলো না। রাত যত দীর্ঘই হোক না কেন একটা সময় প্রভাত হয়। খোকনের জীবনেও প্রভাত আসে। অনেক কষ্টের পরে আসে সোনালী সেই ভোর। সে নিজের প্রচেষ্টায় ছোট খাট একটা কোম্পানী দাঁড় করিয়ে ফেলে। মতিঝিলে একটা ফ্লাট কেনার চেষ্টা করে। স্বপ্ন দেখে সোনালী এক সুদিনের।

২০০৫ সালের কথা। খোকনের জীবনে নতুন কিছু ঘটে যায়। খোকন প্রেমে পড়ে। তাও একটা ছেলের প্রেমে। তার নিষ্ঠুর পৃথিবীতে এক চিলতে সুখের বাতাস বয়ে যায়। এটাকে ঠিক প্রেম বলা যায় কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। ছেলেটার সাথে এখনও দেখা হয় নাই। সামাজিক যোগাযোগ সাইট Hi5 এ পরিচয়। হাই ফাইভে খোকনের নাম নিও অরটন। আর সেই ছেলেটার নাম নীল রোহিত। নীল লোহিত হলে নামটা অর্থপূর্ণ হত। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনিলের ছদ্মনাম নীল লোহিত। ছেলেটার আসল নাম হয়তো রোহিত। হয়তো বলছি এজন্য যে আজকাল ইন্টারনেটের অধিকাংশ মানুষ ছদ্মনামের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পছন্দ করে।

রোহিত এবার ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে। তার বাসা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। ছেলেটার কথা বার্তা রহস্যময়। কোন কিছুই খোলসা করত না। হেঁয়ালি ভরা কথা বার্তায় থাকত অন্যরকম এক সরলতা। আর এটাই খোকনের খুব ভালো লাগত। রোহিত সব সময় খোকনের খবর নিত। কি খেয়েছে, কখন খেয়েছে। এত এত প্রশ্নে সে মোটেও বিরক্ত হত না। নিষ্ঠুর পাষাণ এই শহরে সে এক মুঠো ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে কম্পিউটারের ভিতর এক অজানা রাজ্যে। আর এটাই মূলত নেশার কারণ। রোহিত খোকনকে বলত তার মতই কাউকে সে এতদিন খুঁজছিলো। এত দিনে সে খুঁজে পেয়েছে মনের মানুষ। খোকনকে সে অনেক অনেক ভালোবাসবে। চিরকাল খোকনের

পাশে থাকবে। খোকন সমকামিতার স্বাদ পেয়েছে অনেক আগেই। কোন এক দুর্বল মূহূর্তে পরিচিত কারো দ্বারা। সমকামিতা সম্পর্কে খোকনের ধারণা অন্যরকম ছিলো। দুজন পুরুষ জৈবিক তাড়নায় একে অন্যের সাথে মিলিত হয় এটা সে বোঝে। শুক্রাণু ক্ষরণের পরেই সে তাড়ণা মিলিয়ে যায়। দুজন দুজনের জগতে ফিরে যাবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুজন পুরুষে ভালোবাসা সম্ভব এটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকতো না। দুজন পুরুষে আবার কিভাবে ভালোবাসা সম্ভব। কিন্তু পাথরে ফুল ফুটিয়েছে রোহিত। খোকন সত্যি ভালবেসে ফেলেছে রোহিতকে। অনেকে প্রথম দেখায় প্রেমে পড়ে। আর সে না দেখা কল্পনার মানুষটির প্রেমে পড়েছে।

রোহিতের সাথে প্রতিদিন ফোনে কথা হয়। কত কত বিষয় নিয়ে তারা গল্প করে তার ইয়ত্বা নেই। কথায় কথায় রাগ, অভিমান, কথাকাটাকাটি সবই চলতে থাকে। বিছানায় শুয়ে কথা বলে খোকন। তার চোখ থাকে ঘরের সিলিং এর দিকে। কিন্তু সে চোখ কিছুই দেখে না। সে না দেখা রোহিতের মুখকে কল্পণা করে। যে মানুষের কথা এত সুন্দর, এত সাজানো গোছানো সেই মানুষটি কেমন দেখতে! কথায় কথায় সারা রাত কেটে যায়। ভোরের আলো ফোঁটে। ফোনের ব্যালেন্স ফুরিয়ে যায়। এক্সট্রা রিচার্জ কার্ড কিনে রাখে খোকন। রোহিতের সাথে কথা না বলতে পারলে তার কিছুই ভালো লাগে না। বুকের ভেতর আঁকুপাকু করে। মতিঝিল থেকে ক্যান্টনমেন্ট খুব বেশী দূরে নয়। সে একেকদিন বাসে করে চলে যায় ক্যান্টনমেন্টে। রোহিতকে ফোন দেয়। রোহিত আসবে বলে। রাস্তা ধরে পায়চারি করে। শক্ত মনের মানুষ সে। তবু হার্টবিট বেড়ে যায়। হালকা ঘাম ফুঁটে ওঠে কপালে। রোহিতের জন্য অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। তবু রোহিতের দেখা মেলে না। ফোনে ফোন দেয়। রোহিত ফোন রিসিভ করে না। যে ছেলে ফোনে , চ্যাটিং এ ভালোবাসার কথার ফুলঝুরি ছোটায় সে সামনে কেন আসে না এটাই খোকন বুঝতে পারে না। ভগ্ন হৃদয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে আসে। খুব বিমর্ষ লাগে। মনে হয় ঘুমে দুচোখ বুজে আসছে। কিন্তু ঘুম আসে না। রোহিতকে সে আবার মেসেজ পাঠায়। রোহিত মেসেজের উত্তর দেয়। আবার কথা শুরু হয়। কথার পিঠে কথা হয়। লাভ চ্যাটে রাত ভোর হয়।

খোকন আবার ক্যান্টনমেন্টে যায় রোহিতকে এক নজর দেখার আশায়। কিন্তু রোহিত দেখা দেয় না। হয়তো রোহিত তার পাশে দিয়ে হেঁটে গেছে কিন্তু সে চিনতে পারে না। এরকম বেশ কয়েকবার হলো। রোহিত কথা দিয়েও কথা রাখে নাই। খোকন অপেক্ষা করে করে ফিরে এলো। শেষ দিন খোকন দুঃখ কষ্ট সহ্য না করতে পেরে রাগে ক্ষোভে একটা মেসেজ দিলো রোহিতকে, "আমাদের আর কোন দিন দেখা হবে না"।

তাদের আর কোন দিনই দেখা হয় নাই। রোহিত সেই মেসেজের উত্তর দেয় নাই। খোকনও রোহিতকে আর কোন মেসেজ পাঠায় নাই। অনেক দিন কেটে যায়। রোহিত হারিয়ে গেলো। খোকন জানে এই শহরেই আছে। কিন্তু বের করতে পারে না মানুষটিকে। কিন্তু রোহিতকে দেখার উগ্র বাসনা খোকনের মনে আজো সুপ্ত রয়ে গেছে। হাই ফাইভের চল এখন আর নেই। ফেসবুকের পাতায় পাতায় এখনো সে রোহিতকে খুঁজে ফেরে। রোহিত নামে কোন আইডি দেখলে সে ঢু মারে তার প্রোফাইলে। ছবি দেখে। চেনার চেষ্টা করে।

২০১৪ সাল। তরতর করে অনেকটা সময় কেটে গেছে। অনেক কিছুই বদলে গেছে। খোকন আর আগের মত উগ্র ভালোবাসার কাঙাল নেই। বিয়ে করে স্থির হয়েছে। যদিও সমকামী জীবনকে সে ছাড়তে পারে না। খোকন এখন দুই সন্তানের জনক। ছেলেরা বড় হচ্ছে। এখন এসব ছাড়া উচিত বলে মনে করে সে। তার সেই ছোট্ট কোম্পানী এখন বেশ বড় হয়েছে। অনেক লোক সেখানে কাজ করে। ইত্তেফাকের মোড় পেরিয়ে কিছু দূরে তার ফ্লাট। পাঁচতলায় দক্ষিন মুখো বেলকনিতে দাঁড়িয়ে সে এখনো রোহিতের কথা ভাবে। প্রেম! প্রেম সে অনেক গুলোই করেছে। অনেক রোহিত এসেছে তার জীবনে। কিন্তু স্থির হতে পারেনি কারো সাথে। খোকন আমার ফেসবুক ফ্রেন্ডলিস্টে আছে অনেক দিন হলো। হাজার হাজার মানুষের ভীড়ে তাকে আলাদা করে দেখার মত কিছু পায়নি আমি। প্রথম সে আমার নজরে আসে ২০০৯ সালের দিকে। তখন আমি সেন্ট মার্টিন সি

বিচে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাত দিনের শিক্ষা সফরে এসেছি। আমি বরাবরই ফেসবুকের পোকা। যেখানেই যাই না কেন ফেসবুক আমার সাথে থাকে। সিবিচে বসে ফেসবুক গুতাই। দেখতে পেলাম খোকন তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে হানিমুনে এসেছে। কালার ম্যাচ করা পোশাক পরে তারা অনেক ছবি আপলোড করেছে। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে। পেছনে বঙ্গোপসাগরের নীল ক্যানভাস। আকাশে সাদা সাদা মেঘ। আমি একটার পর একটা ছবি দেখে যাই। কিছুটা আফসোস বোধ করি। ইশ! আমার যদি কেউ থাকত। এভাবে ছবি তোলার সৌভাগ্য কি কখনো হবে আমার! আমি খোকনকে নক করিনি। কিন্তু মাথার ভেতর তার হানিমুনের ছবিগুলো গেথে গেছে। যদিও খোকন খুব বেশী বন্ধু বৎসল নয় তবু একটা সময়ে খোকনের সাথে বেশ ভালো বন্ধুত্ব তৈরী হয়। রোহিতের গল্প শুনে আমিও রোহিতকে দেখার আগ্রহ বোধ করি। রোহিত কি আমার লেখা এই গল্প পড়বে কোন দিন!

টিনেজ ছেলেদের প্রতি আক্রোশ বোধ করে সে। কিছুদিন প্রেম করার পরে সে তাদের ছ্যাঁকা দেয়। টিনেজদের ছ্যাঁকা দিয়ে এক অসুস্থ আনন্দের স্বাদ পায় সে। ছ্যাঁকা খেয়ে কিশোর ছেলেগুলো কান্নাকাটি করে, ঘ্যান ঘ্যান করে। চাপা উল্লাসে ফেটে পড়ে তার মন। মাঝে মাঝে নিজেকে তার স্যাডিস্টিক মনে হয়। মনে হয় সে যা করছে সেটা উচিত নয়। তবুও সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারে না। এই জগত থেকে বেরিয়ে যেতে চায় । কিন্তু পারে না। রোহিত কে দেখার ইচ্ছে গুমরে মরে। শুধু একবার দেখতে ইচ্ছে করে সেই ছেলেটিকে। নিশ্চয়ই এখন সে অনেক বড় হয়ে গেছে। একবার তাকে জিজ্ঞেস করতে চায়। শুধু একবার। "ভালো যদি নাই বাসবে তবে ভালোবাসা জাগালে কেন ?"

কত প্রশ্ন যে নিরুত্তর রয়ে যায়। উত্তর দেবার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না।

বৈরী বসন্তে

- আই লাভ ইউ ইমু।

- দূর হ পোড়া মুখো। সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে। তুই যাস না কেন! খাঁচা খুলে দিয়েছি তাও কেন যাসনে। দূর হয়ে যা। আমাকে আর জ্বালাতন করিসনে।

কথা শেষ করে হাতের কাছের দলাবদ্ধ কাগজটা ছুড়ে মারলো। পোষা পাখিটা উড়ে গিয়ে অদূরে বসে বললো, আই লাভ ইউ ইমু।

অনেক কষ্টের মধ্যেও হেসে ফেললো ইমু। পাখিটাকে তারা দুজন একসাথে গিয়ে কিনে আনে কাঁটাবন থেকে। দুজনের নামের আদ্যক্ষর মিলিয়ে নাম রেখেছিলো ইশু। ইমরানের ডাক নাম ইমু আর ফয়সালের ডাক নাম শুদ্ধ। ইমু মজা করে ডাকতো বিশুদ্ধ। যদিও শুদ্ধর সাথে পরিচিত হওয়ার আগে ইমুর জীবনে অনেক কিছু ঘটে গেছে। অনেক ঘটন অঘটনের পরে শুদ্ধ এসেছিলো ইমুর জীবনে। বসন্ত হাওয়ার মতো। শরীর জুড়ানো অনুভূতি নিয়ে। পলাশ শিমুলের আবেশ ছড়িয়ে।

সমকামী জগতে ইমু কিভাবে ঢুকে যায় তার ঠিক মনে নেই। অন্য আট দশজনের মতই সেক্সকেন্দ্রিক ছিলো তার চিন্তা ভাবনা। এলাকার কোন ভাইয়ের হাত ধরেই এমনি কোন উষ্ণরাতে সে পেয়েছিলো প্রথাগত ধারণার বাইরে যৌন অভিজ্ঞতা। একসময় সে এটাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহন করে নেয়। আরো অনেক সমকামীর সাথে পরিচিত হয়। কিস, সাক অস্বাভাবিক বলে মনে হতো না কিছুই। কিন্তু একদিন বিপত্তি ঘটে গেলো। কোথায় কে রেকর্ড করেছিলো ইমু বলতে পারবে না। এক ছেলের সাথে ইমুর চুমুর ভিডিও এলাকার সব মোবাইলে ছড়িয়ে গেলো। ছেলেটার মুখ বোঝা না গেলেও স্পষ্ট ইমুর মুখ বোঝা যাচ্ছিলো। বাইরে বেরোনো যায় না। সবাই

মুখ টিপে হাসে। ফাজিল ছোকড়ারা বলে আসো চুমু খেয়ে যাও। ইমুর বাবাকে পথে ঘাটে কথা শুনতে হয়। ছেলে কি বাপের কাছে চুমু খাওয়া শিখেছে? বাবা অনেক রাগী। রেগে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বাড়ি এসে সোজা ইমুর গালে ঠাস করে সজোরে এক থাপ্পড় মেরে বললেন, শালা হিজড়ার বাচ্চা হিজড়া। আমার ঘরে হিজড়া জন্মেছে। যা বাজারে গিয়ে শাড়ি চুড়ি পরে ব্যাটা ছাওয়ালগে সাথে ছেনালগিরি করগে। আমার বাড়িতে তোর আর জায়গা হবে না। দূর হয়ে যা। এ আমার ছেলে কিছুতেই হতে পারে না। হিজড়ার বাচ্চা হিজড়া। তুমি কই থেকে এই জিনিস বাধায়া আনছো।

অদূরে মা দাঁড়িয়ে কাঁদছিলো। ইমুর ব্যাগ গোছানোর মানসিকতা ছিলো না। এমনিতে আজ তিনদিন ঘরের মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলো। তার উপর জোর থাপ্পড়ে মেজাজ খুব খারাপ করে দিয়েছে। হাতের কাছে যা ছিলো তাই টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মা অনেক কান্নাকাটি করলেন। 'যাস নে বাবা যাসনে'।

বাবা হুংকার ছাড়লেন। 'যেতে দাও ওকে। ওরকম কুলাংগার ছেলের দরকার নেই আমার।যাদের ছেলে থাকে না তারা কি বাঁচে না। আজ থেকে আমার শুধু এক মেয়ে'।

কোথায় যাবে ইমু! ভেবে কিছুই পেলো না। বিকেলের বাস ধরে খুলনা চলে এলো। শফিক ভাইয়ের সাথে দেখা হলো। এলাকার ভাই। ইমুর সাথে বেশ কয়েকবার হয়েছে। শফিক ভাই এলাকার ঘটনা জানতেন সব। ইমুকে জিজ্ঞেস করলো,

- তো এখন কি করবি ঠিক করলি?
- জানিনা। উপায় খুঁজে পাচ্ছি না।

- আমার সাথে ঢাকা চল। আমার মেসে থাকিস। একটা কাজ টাজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।
- ইন্টারমিডিয়েট পাশ সার্টিফিকেটে কি কাজ হবে?
- কিছুনা কিছু হবে। যাবি কিনা বল।

শফিকের সাথে ইমু ঢাকা চলে এলো। দেখতে শুনতে মন্দ ছিলো না ইমু। বিভিন্ন জনের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবাদে স্মার্ট ব্যবহার শিখে ফেলেছে। বসুন্ধরা সিটিটে মোবাইল শোরুমের আউটলেটে একটা চাকরি জুটে গেলো। মাস শেষে দশহাজার টাকা। চলার মতই। শফিক ভাইয়ের সাথে বেড শেয়ার করা যাচ্ছে। কিন্তু সারাদিন পরিশ্রমের পরে শফিক ভাইয়ের চাহিদা মেটাতে হচ্ছে। মাস না পেরোতেই শফিক ভাইয়ের বন্ধুরা আসতে শুরু করলো। শফিক সরাসরি ইমুকে গে বলেই পরিচয় করিয়ে দিতো। সিংগেলের বদলে গ্রুপ সেক্সের মাত্রা বাড়তে লাগলো। ইমু অসহ্য হয়ে গেলো। থাকার মত জায়গার ব্যবস্থা না করতে পারলে তার মুক্তি নেই ইমু বুঝে গেছে। এরা সব শফিকের বন্ধু নাকি শফিক ভাই ইমুকে ব্যবহার করে টু পাইস কামাচ্ছে। পর্নোম্যুভিতে যেরকম দেখা যায়, সেলিং মাই জিএফ টাইপ।

বসুন্ধরা সিটির সাপ্তাহিক ছুটি মংগলবার। প্রতি মংগলবার ইমু ওভারব্রিজের গায়ে গায়ে সাইনবোর্ড সিট খালি আছে টাইপ বিজ্ঞপ্তি দেখে বেড়ায়। আর যাই হোক নতুন কোন পরিবেশে গিয়ে নিশ্চয় তাকে এই যৌন নিপীড়ণের শিকার হতে হবে না। বেশ কয়েকটা বাসা দেখা হয়ে গেছে। অত্যাধিক ভাড়া। আজ একটা বাসায় যাচ্ছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ইমু ঢোক গিললো। এত সুন্দর বাসা। ভাড়া না জানি কেমন চায়। ভাবছিলো ফিরে যায়। এতটা পথ হেঁটে এসেছে। ঘেমে গেছে। রিকশাভাড়া বাঁচিয়ে কিছু সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে। তার গতি নিজেকেই করতে হবে। একটা কিছু হয়ে গেলে কে দেখবে তাকে। ফুটপাতে পড়ে মরতে হবে। বিশাল এই পৃথিবীতে গনমানুষের ভিড়ে বড্ড একা সে।

পকেট থেকে মোবাইল বের করে ফোন দিলো, হ্যালো আমি ইমু। ইমরান। আপনার সাথে আমার কথা হয়েছিলো। বাসা দেখার ব্যাপারে। আজ আসার কথা ছিলো।

ফোনের ওপাশ থেকে গলা ভেসে এলো, ওহ আপনি এসে গেছেন। আচ্ছা আমি এখনি আসছি।

গেট ঠেলে সুদর্শন এক যুবক বেরিয়ে এলো। হাফ প্যান্ট আর ম্যাগি গেঞ্জি পরা। একটা সময় ছিলো যখন ইমু এরকম ছেলে দেখলে ফিরে তাকাতো। এখন আর সে ফিলিংস নেই। সময় বড্ড দ্রুত তাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে। সুদর্শন হাত বাড়ালো, হ্যালো আমি শুদ্ধ। আসেন ভেতরে আসেন।

বাড়িটাতে বেশ কিছু ভাড়াটে থাকে। দোতলার ছোট্ট একটা ফ্লাটে এসে ইমু থামলো। একটা বেডরুম, ডাইনিং স্পেস, ছোট্ট কিচেন। শুদ্ধ বললো, আমি মূলত একলা থাকতে ভালোবাসিনে। তাই রূমমেট খুঁজি। আমার সাবেক রূমমেট হঠাৎ রুম ছেড়ে দিয়ে গেলো। সব তো দেখলেন। পছন্দ হলো?

ইমু ঘাড় নাড়ে। হ্যাঁ। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, ভাড়া কত?

- পাঁচ হাজার। সাথে গ্যাস বিদ্যুতের বিল, খাওয়ার খরচ আলাদা।
- ওহ।
- কোন সমস্যা?
- আমার জন্য একটু বেশী হয়ে যায়।
- কি আর করা বলেন। বাড়িওয়ালা তো বোঝে না।

এই রুম নিলে শুভ্র দশহাজার টাকার সবই খরচ হয়ে যাবে। যাক। তবুও তো শফিকের হাত থেকে বাঁচা যাবে। পরের মাসের এক তারিখ থেকে ওঠার কথা। শুদ্ধ বললো চাইলে সে কালকেই উঠতে পারে। ভাড়া পরের মাস থেকে দিলেই হবে। আজ মাসের বারো তারিখ। ইমু উঠে এলো শুদ্ধের ফ্লাটে। শুদ্ধ ছেলেটা অসম্ভব রকম ভালো এবং ফ্রেন্ডলি। ইমু যে বড্ড একা এটা শুদ্ধ বুঝে ফেললো কয়েকদিনে। খুব মন মরা হয়ে থাকে। দুজনের বন্ধের দিন দুই দিন। শুদ্ধ ব্যাংকে জব করে। অনেক পরিশ্রান্ত হয়ে ফেরে তবুও চেষ্টা করে ইমুকে হাসি খুশী রাখতে। একেকদিন রাত নটা দশটার দিকে ইমুকে বাইকের পিছে বসিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসে। টিএসসির মোড়ে, সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে দাঁড়িয়ে ফুচকা খায়। মজা করে ভাসমান পতিতাদের সাথে দামাদামি করে। অনেক সময় অনেক কম দাম বলা সত্ত্বেও কেউ কেউ রাজি হয়ে যায়। তখন তারা বিপাকে পড়ে যায়। শুদ্ধ বলে বুঝে বলো। আমরা কিন্তু দুজন। পরে আবার টাকা নিয়ে হাঙ্গামা করবানাতো।

- ভাইরে দুজন না চারজন দেখার সময় নেই। করে টাকা দাও। সারাদিন কিছু খাইনি। আর পারছি না।

শুদ্ধ মানিব্যাগ বের করে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে মাথা নিচু করে চলে আসে। পতিতা নির্বাক চোখে তাকিয়ে থাকে। ইমু অবাক হয়। শুদ্ধ ছেলেটা এত ভালো কেন। শুদ্ধের প্রতি তার অসম্ভব রকমের টান তৈরী হয়। শুদ্ধকে সে কিছুই বুঝতে দেয় না। বছর খানে কেটে গেলো কোন দিক থেকে টের পেলো না। এরই মধ্যে ইমুর পারফর্ম্যান্সে খুশী হয়ে বেতন বাড়িয়ে পনেরো হাজার করা হয়েছে। ইমুর কাস্টমারকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে। বেশ কিছু নামী দামী আউটলেট তাকে ভাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। শুদ্ধও বলছে জব চেঞ্জ করতে। কিন্তু ইমু যেতে পারে না। তার দুর্দিনে এরা চাকরি না দিলে কি যে হতো আল্লাহই জানেন। শুদ্ধ হাসে, যখন তোমার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখন পাছায় লাথি মারতে কুন্ঠা বোধ করবে না ইমু। জগতটা এরকমই। সময় থাকতে সাবধানী হও।

এক বিকেলের কথা। বাতাসে বসন্তের আবাহন। শুদ্ধ এসে বললো, ইমু। সে ঘাড় তুলে তাকালো। শুদ্ধ বেশ অস্থির। চোখ ফিরিয়ে নিলো। শুদ্ধ আবার তাকালো। বললো, তোমার কলমটা দাও। ইমু কলম এগিয়ে দিলো। কিচ্ছুক্ষণ আবার ফিরে এলো। ইমু জিজ্ঞেস করলো,

- তুমি প্রেমে পরেছো?

- হ্যাঁ।

- ওয়াও। কে সে ভাগ্যবতী।

- ভাগ্যবতী না।

- না? কেন?

- সে তুমি?

ইমু বিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায়, কি বলছো তুমি?

- সত্যি বলছি। তোমার চোখে চোখ রেখে বলছি। আই লাভ ইউ ইমু। তুমি কি আমাকে ভালোবাসবে?

চোখ ফেঁটে কান্না এলো ইমুর।

- তুমি আমার অতীত জানো না শুদ্ধ ভাই। জানলে আমাকে শুধু ঘৃণাই করবে।

- আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার অতীত না জানলে তোমাকে জানি। আমার হৃদয়কে জানি। এর থেকে বড় সত্য আর কিছু হতে পারে না।

ইমু শুদ্ধকে ফিরিয়ে দিতে পারে নি। সমকামী জগতে যে শুধু সেক্স নয় ভালোবাসাও যায় তা আবিষ্কার করতে শুরু করলো ইমু। ভালোবাসায় উন্মাতাল হয়ে উঠলো দুজন। আর তখনি ইশুর আগমন। ছোট্ট ময়না পাখিটি। তখনো বোল ফোঁটেনি। প্রথম বোল ফুটলে শুদ্ধ তাকে বলতে

শেখালো আই লাভ ইউ ইমু। ইমু চেষ্টা করেছে আই লাভ ইউ শুদ্ধ বলাতে। কিন্তু পাজি পাখিটা একদম কথা শোনেনা। সে উলটো বলবে আই লাভ ইউ ইমু।

শুদ্ধ আর ইমুর ভালোবাসার ডালপাশা আশপাশে ছড়ালো। সে এতদিন যেন চোখ বুজে ছিলো। রমনা পার্কে যে এত এত গে দের সমাবেশ ঘটে তা এতদিন দেখতেই পায়নি। কিন্তু এসবের প্রতি সে ফিরেও তাকায় না। তার এখন শুদ্ধ আছে। তার ভালোবাসা।

কিন্তু কপালটাই যে খারাপ। দুবছরের মাথায় আবার কপাল পুড়লো। শুদ্ধ মায়ের একমাত্র সন্তান। বাড়ি থেকে মা বিয়ের চাপ দিচ্ছে। শুদ্ধর মাকে ইমু বেশ কয়েকবার দেখেছেন। স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মার্জিত রূচির মানুষ। তাকেও ছেলের মত আদর করেছেন। বাবা মায়ের কথা জিজ্ঞেস করারে ইমু বিব্রত বোধ করলে তিনি পরিস্থিতি হালকা করে দিলেন। ইমুর অতীত এখন শুদ্ধ জানে। দাড়ি কমা সহ। শুদ্ধেরও বেশ মায়া হয়। শুদ্ধ তার মাকে সব বলে দিয়েছে। সে প্রথাগত বিয়ে করতে পারবে না। ইমুকে ভালোবাসে।

এক মংগলবার বিকেলে উদভ্রান্তের মত শুদ্ধর মা এসে হাজির। ইমু দরজা খুলে দিলো। ভেতরে ভেতরে এত কিছু হয়ে গেছে শুদ্ধ তাকে কিছু বলেনি। শুদ্ধের মা আস্তে আস্তে সব খুলে বললেন, পারলাম না বাবা। অনেক বোঝালাম মনকে। ভেবেছিলাম ছেলে যেভাবে চায় বাঁচুক। কিন্তু ছেলে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ওকে ঘিরেই আমার সব স্বপ্ন। এদেশে এখন তোমাদের স্বীকৃতি নেই। এভাবে তোমরা কতদিন বাঁচবে। এই সমাজ তোমাদের বাঁচতে দেবে না। তিলে তিলে মারবে। মা হয়ে কিভাবে মেনে নেবো সন্তানের মৃত্যু। জানিনা তোমাদের কাছে স্বাভাবিকতার সংগা কি। কিন্তু আমি আমার ছেলের স্বাভাবিক জীবন চাই। আর দশজন স্বাভাবিক মানুষের মত। আমার উঠোনে নাতি নাতনীরা খেলা করছে আমার এই স্বপ্ন কি অপূর্ণই রয়ে যাবে বাবা।

ইমু শুদ্ধের মায়ের হাত ধরে, আপনি চিন্তা করবে না। শুদ্ধ বিয়ে করবে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি।

শুদ্ধ যে এত গোয়ার ইমুর জানা ছিলো না। কিছুতেই রাজী করানো যাচ্ছে না। সপ্তাহ খানেকের প্রচেষ্টায় তাকে রাজী করানো গেলো। শুদ্ধর একটাই প্রশ্ন, তোমার কি হবে ইমু?

- আমার যা হওয়ার হবে। ভাসতে ভাসতে এসেছিলাম। ভাসতে ভাসতে বাঁচবো।
- না। তুমি এই বাসাতেই থাকবে। আমি তোমার সব খরচ বেয়ার করবো।
- না শুদ্ধ। তুমি বিয়ের পর আমার সাথে আর যোগাযোগ রাখবে না। কথা দাও। এই কথা আমি দিতে পারবো না ইমু।
- কথা তোমাকে দিতে হবেই।

ইমু জানেনা ভালোবাসার মানুষকে সরিয়ে দিয়ে ভূল করলো কিনা। বিশাল এই পৃথিবীতে সে বড্ড একলা হয়ে গেছে। তবুও তো একজন মায়ের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছে। যে মা তার সন্তানকে বোঝার চেষ্টা করেছে। শুধু যাসনে বাবা যাসনে বলে চেচায়নি। মা কি পারতো না চলে আসার দিন তার পথ আটকে দাঁড়াতে। নাকি মাও লজ্জা পাচ্ছিলো হিজড়া ছেলের জন্য! ছেলে হয়ে ছেলেকে চুমু খেলেই বুঝি হিজড়া হয়ে যেতে হয়।

আবার বসন্ত এসেছে। শুদ্ধর বিয়ে হয়ে গেলো। ঘরের কোনে কোনে শুদ্ধর স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। বিছানার ভাঁজে, বেলকনির টবে। শুদ্ধ বিছানায় শুয়ে আছে। চোখের কোনা বেয়ে জল ঝরছে।

পোড়া চোখ আর কত জল ঝরাবি। ইশু উড়ে এসে শুদ্ধের বুকের উপর এসে বসলো, আই লাভ ইউ ইমু। ইমু শব্দ করে কেঁদে উঠলো।

কলিংবেলের শব্দ শুনে ইমু দরজা খুললো। দরজার বাইরে শুদ্ধর মা দাঁড়িয়ে আছে। পাশে ইয়া বড় লাগেজ।

- আপনি?

- হ্যাঁ। আমি। তুমি আমাকে স্বপ্ন দিয়েছো। আমি তোমাকে মা দেবো। মায়ের কি জায়গা হবে নতুন ছেলের ঘরে?

ইমু নিচু হয়ে শুদ্ধের মায়ের পা ছুয়ে কদমবুচি করলো। পোড়া চোখে আবার কেন জল এলো।

ফেইক আইডি

'মর তুই মাগী। তোর এই শাস্তি দরকার ছিলো। এখন তোর অহংকার কই গেলো!'

টুকু প্রতুত্তোরে কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে ফোন কেটে দেওয়া হয়েছে। তবুও সে অনিশ্চিত স্বরে বারদুয়েক হ্যালো হ্যালো বললো। টুকু ভাবতে পারছে না। এখন কি হবে! সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। বিদ্রুপ করছে। কি করবে কিছু ভেবে না পেয়ে মোর্শেদ কে ফোন দিয়েছিলো। ভেবেছিলো বুঝিয়ে শুনিয়ে বললে রাজী হবে। রাজী তো হলোই না উলটো গালাগালি করলো। তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। এখনকার দিনে সবারই ফেসবুক আছে। আম্মার ফেসবুক একাউন্ট

নেই। কিন্তু বাবার আছে, ছোট ভাইটার আছে। ওদের কারো সামনে এই পোস্ট পড়ে গেলে কি হবে। কত কষ্ট পাবে তারা। তার ব্যবহার না হয় একটু অন্যরকম। হুটহাট কথা বলে ফেলে, অত ভাবনা চিন্তা করে না। মনে আসার আগেই কথা যেন মুখের ডগায় চলে আসে। তাই বলে এই শাস্তি পেতে হবে! সারাদিন সে আর ঘর থেকে বেরুলো না।

বিকেলবেলা সাদ ঘরে ঢুকে দেখলো পুরো ঘর অন্ধকার। সাদ হচ্ছে টুকুর ক্লাসমেট এবং বন্ধু। একই সাথে কলেজে পড়ছে। দুজনই মফস্বল থেকে উঠে এসে খুলনা পাবলিক কলেজে ভর্তি হয়েছে। কলেজ হোস্টেলে একগাদা ছেলে থাকে। পড়াশোনা যাতে ভালো হয় সেজন্যই তো ভালো কলেজে ভর্তি করানো। তাই কষ্ট হলেও দুজনের বাবা মাই সামর্থ্য অনুযায়ী ভালো রাখার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছে। এক রুমের ছোট্ট ফ্লাট। সাদ লাইটের সুইচ অন করলো। বিছানার উপর টুকু নিশ্চুপ শুয়ে আছে।

- কিরে দোস্ত। শরীর খারাপ?

টুকু সাড়া দিলো না। চুপচাপ শুয়ে আছে। সাদ এগিয়ে এসে গায়ে হাত দিলো। না জ্বর আসেনি। সিজন চেঞ্জের সময় জ্বর আসা টুকুর অভ্যেষে পরিনত হয়েছে। টুকুর চোখের কোনে জল যেন চিকচিক করছে। সাদ টুকুকে একটু নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে?

টুকু তেমনি নিশ্চুপ শুয়ে থাকলো। সাদ বললো, বুঝিনা বাপু তোদের এই বয়সের পোলাপাইনের মতিগতি। ফোন বন্ধ রেখেছিস কেন? কাকীমা অনেক টেনশান করছেন। বাড়িতে রাগারাগি করেছিস। নে ফোনের সুইচ অন করে কাকীমার সাথে কথা বল। আমি গোছল দিয়ে নেই। গরম এসেই পারলো না এর মধ্যে ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছি। কাছে পিঠে কোন জিমে ভর্তি না হলেই না।

অন্যসময় সাদকে টুকু মটু মটু বলে খেপিয়ে অস্থির করে রাখে।সাদ অন্যদের তুলনায় একটু স্বাস্থ্যবান। গুল্টু গুল্টু আদুরে চেহারা। আজ সেই ব্রম্মাস্ত্র স্বয়ং সাদ টুকুর হাতে তুলে দেওয়া সত্ত্বেও সে সাড়া দিলো না। সাদ গোছল খানায় ঢুকে গেছে। দরজার ওপাশ থেকে পানির ঝিরঝিরে চাপা শব্দ ভেসে আসছে। টুকু হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিলো। ফোন ওপেন করার রুচি তার নষ্ট হয়ে গেছে। গত দুই রাত থেকে আননোন নাম্বার থেকে প্রচুর কল আসছে। অশ্লীল সব কথা বলছে। কুপ্রস্তাব দিচ্ছে। ঘটনার সুত্রপাত ঘটেছে ফেসবুক থেকে। বছরখানেক হলো টুকু বিশেষ কারণে ফেসবুকে ফেক আইডি খোলে। একটা সময়ে টুকু নিজের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতি অনুভব করে। তার নিজেকে খুব একলা মনে হতো। বিষণ্ণ লাগতো। মনে মনে সৃষ্টিকর্তার কাছে বারবার প্রশ্ন করতো কেন তুমি আমার মধ্যে আদ সাদ লুতের কওমের ফিলিংস গ্রো করলে খোদা? সৃষ্টিকর্তা কখনো বান্দার ডিরেক্ট প্রশ্নের উত্তর ডিরেক্ট দেন না। মানুষের প্রশ্নের উত্তর ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে দেওয়া সকল ধর্মের সৃষ্টিকর্তার এক অপার মহিমা। টুকু অচিরেই আবিষ্কার করলো ফেসবুকে তার মত অজস্র মানুষ আছে। সে একা নয়। আদ সাদ লুতের কওমেরা যেন মরে না। ধর্মের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রক্তবীজের মত তারা বেঁচে রয়েছে শিরা উপশিরায়।

অচিরেই টুকু বুঝে গেলো ফেইক আইডি কাকে বলে এবং কেন খুলতে হয়।অনেকটা লেখকদের ছদ্মনাম ব্যবহার করে লেখালেখির মত। যে যার মনের অভিব্যক্তিগুলো মুখোশের আড়ালে মুখ লুকিয়ে বলে চলেছে নিরন্তর। তবে অধিকাংশই ভাল্লার। সেক্সের বাইরে এরা চিন্তা করতে পারে না। অল্প দুয়েকজন আছে যারা অনুভুতি গুলো নিয়ে লিখছে। টুকুর মাঝে মাঝে মনে হয় আরে এতো আমার মনের কথাই লিখছে। অনেকে আছে বেশ ফানি টাইপ। স্ট্যাটাসে স্ট্যাটাসে মজা করে। একলা পথিক ভাই আছে। কি চমৎকার গল্প লেখে। টুকু পড়ে আর মুগ্ধ হয়। এরা সব ঢাকায় থাকে। খুলনায়ও কিছু আছে। কিন্তু সবার সেক্সুয়াল চাহিদা বেশী। টুকু সাহস করে কয়েকজনের সাথে মিট করেছে। একজনের সাথে দেখা হয়েছিলো হাদিস পার্কে। প্রথম দেখা। বিকেলে ইউসুফ স্যারের কাছে ক্যামিস্টি পড়তে না গিয়ে সোজা চলে গেছিলো হাদিস পার্কে। বুক

একটু দুরু দুরু করছিলো। কথা হলো ভাইয়াটার সাথে। আহামরি দেখতে নয়। মোটামুটি লুকের। কিসে যেন জব করে। শানবাধানো বেঞ্চে বসে দুজন গল্প করলো। বাদাম খেলো। ভাইয়াটা মজা করে বললো, এত দূরে বসেছো টুকু! মেয়েরাও তো আজকাল এত লজ্জা পায় না।

টুকুর সাহস বেড়ে গেছিলো। আরো কয়েকজনের সাথে দেখা করলো সে। না ফিজিক্যালী কিছুই হয়নি। টুকু এটুকু বুঝতে পেরেছে তার আরো সময় নেওয়া উচিত। মোর্শেদ ভাইয়ের সাথে দেখা হয় নিউমার্কেটের সামনে। অমায়িক মানুষ। দেখতে সুন্দর। হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেলো দোতলার কফিশপে। তার ব্যবহারটা খুব আপন আপন। ফেরার পথে টুকুর রুম খালি আছে কিনা জিজ্ঞেস করলো। টুকু বললো, ভাইয়া আমি এখনি এসব চাচ্ছি না। মোর্শেদ মুচকি হাসলো। তারপর তাদের আরো দেখা হতে লাগলো।। মোর্শেদ ভাইয়া ফোনে এত সুন্দর করে কথা বলেন যে টুকু শুনে মুগ্ধ হয়ে যায়। প্রায়শই টুকু ফোন পেতে লাগলো চলো টুকু আজ এখানে যাই ওখানে যাই। প্রাইভেট ফাঁকি দিয়ে মোর্শেদ ভাইয়ার বাইকে চড়ে একেকদিন বিকেলে চলে যায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচারের সিক্স সেমিস্টারের ছাত্র মোর্শেদ ভাইয়া। সবুজ ঘাসে বসে দুজন কথা বলে। মোর্শেদ ভাইয়া সবসময়ই টুকুকে সেক্সুয়ালী উত্তপ্ত করার চেষ্টা করে। টুকু একদিন বলেই দিলো ভাইয়া আমি এগুলোর জন্যও রেডি না। মোর্শেদ হাল ছাড়ে না। টুকু একই কথা বলে চলে বারবার। একদিন মোর্শেদ রেগে গিয়ে বললো, দেখো টুকু তোমাকে ভালো লাগে বলে অনেক ঢং তোমার সহ্য করি। আমি কি চাই তুমি ভালো করেই জানো। আমাকে বিশ্বাস করতে বলো যে তুমি সত্যিই ভার্জিন। এসব আগে করো নাই। এইসব এক্টিং ছাড়ো। বুঝছো।

টুকু খুব আহত হলো। অর্থ্যাৎ মোর্শেদ ভাইয়া তার কোন কথাই বিশ্বাস করেনি। মেজাজ গরম হয়ে গেলো। সে মোর্শেদ ভাইয়াকে খুব কথা শুনিয়ে দিলো। তারপর দুজন বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য ফোন দিয়েছে। কিন্তু ফল হয়েছে উলটো। কথায় কথায় আবার সংঘাত বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে

টুকু নাচার হয়ে মোর্শেদ ভাইয়ের আইডি ব্লক করে দিলো। রেগে গিয়ে মোর্শেদ ভাই টুকুকে যা তা লিখে মোবাইলে এসএমএস করেছে। দিন দুই ভালোই কাটলো। কোন উপদ্রব নেই। হঠাৎ ফোনে আননোন নাম্বার থেকে কল এলো গতকাল দুপুরের পরে।

- হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম।

- হ্যালো টুকু।

- জি বলছি। কে বলছেন?

- আমাকে তুমি চিনবে না।

- আমাকে কল করেছেন কেন?

- তোমার ছবি দেখে আমি পুরো হট হয়ে গেছি। এত্ত কিউট কেন তুমি?

- কে আপনি? কি বলছেন এগুলো?

- দুশো টাকা কেন? আমি তোমাকে পাঁচশো টাকা দেবো। খুলনায় আসবো আমি।

- ধ্যুর ছাই। কি বলছেন।

- আরে এত ঢং করার কি হলো! মনে হয় কিছুই জানো না। ফেসবুক থেকে তোমার নাম্বার নিয়েছি। বলো কবে আসবো।

- ধ্যুর বাল। যত্তসব।

টুকু লাইন কেটে দিলো। আবার কল এলো সেই নাম্বার থেকে। কেটে দিলো। এরপর অচেনা নাম্বার থেকে কল আসতে লাগলো। কেউ বন্ধুত্বের প্রস্তাব দেয়, কেউ সেক্সের। মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। সন্ধ্যায় একলা ভাইয়ার ফোন এলো। একলা ভাইয়া কেমন যেন ম্যুডি টাইপ মানুষ। খুব একটা কথা বলতে চান না।

- হ্যালো টুকু।

- হ্যালো ভাই।

- কেমন আছো?

- ভালো।আপনি?

- সত্যি ভালো আছো?

- এ কথা কেন বলছেন?

- তুমি কি কিছুই জানো না।

- এখনো জানিনা। কিন্তু মনে হচ্ছে কেউ আমার নাম্বার কোথাও লিখে দিয়েছে। অজস্র ফোন আসছে।

- তুমি কি গরম রড নামের কোন আইডিকে চেন?

- হ্যাঁ। সে তো মোর্শেদ ভাইয়ার...

- কার?

- এক পরিচিত ফেসবুক ভাইয়ার।

- তুমি কি তাকে কোন ছবি দিয়েছো।

- না দেইনি। তবে আমাদের বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে।

- তুমি তার ওয়ালটা চেক করো। বুঝতে পারবে।

- কেন ভাইয়া কি হয়েছে? আমি তো ওনাকে ব্লক করে দিয়েছি।

- ঝগড়া হয়েছে?

- হ্যাঁ। এখন মিটিয়ে নাও। আর একদম মন খারাপ করবে না কেমন। এসব কোন ব্যাপার না। নিয়মিতই এগুলো ঘটে এই ফেক আইডির জগতে। আমাকে একটু বাইরে বেরোতে হচ্ছে।পরে আবার কথা হবে কেমন। বাই।

- বাই ভাইয়া।

টুকুর বুকটা ধড়াস করে উঠলো। সে ফেসবুক খুলে ব্লকলিস্টে গিয়ে গরম রড আইডিটা আনব্লক করলো। ও মাই গড। এ কি করেছে মোর্শেদ ভাই। তার ছবি দিয়ে সাত সাতটা পোষ্ট দিয়েছে। কখন সে ছবি তুলেছিলো টুকু কিছুই আঁচ করতে পারেনি। প্রতিটি ছবির পিছনে কি সব বর্ণনা। টুকুর গা ঘিনঘিনে অনুভূতি হচ্ছে। একটাতে লেখা, এর নাম টুকু। টাকার বিনিময়ে সেক্স করে। প্রতিবার ২০০ টাকা। দুইবারে ৩০০ টাকা।তবে সাবধান। এর কিন্তু সংঘবদ্ধ চক্র আছে। দেখা করার নাম করে ডেকে নিয়ে মানিব্যাগ মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেবে।

সারা রাত সারা দিন ভাবলো টুকু। মোর্শেদ ভাইক ফোন দিলো। ফোন ধরেই বললো, কি মাগী বলেছিলাম না, উচিত শিক্ষা দেবো। হয়েছে শিক্ষা!

সাদ বারবার জিজ্ঞেস করছে। কি বলবো তাকে। সাদ গোছল সেরে বেরিয়ে এসেছে। বেশ ফ্রেশ লাগছে।

দোস্ত কফি খাবি?

টুকু মাথা নাড়ে।

- আচ্ছা তুই কি ফেসবুক রিলেটেড কোন ঝামেলায় পড়েছিস?

টুকুর হার্ট একটা বিট মিস করলো।

- মানে?

- আমি না তোর বন্ধু। আমাকে তোর বলা উচিত ছিলো।

- কি বলতাম?

- এখনো?

- তুই কিভাবে জানলি।

- আমি জানিনি। আমাকে একজন জানিয়েছে। জানিস তো গুজব বাতাসের আগে ছড়ায়। আগে মেয়েদের নিয়ে বুলিং হতো। এখন ছেলেদের নিয়ে শুরু হতো।

- আমি এখন কি করবো দোস্ত?

- কি করবি। বুকে বালিশ লাগিয়ে শুয়ে কান্নাকাটি কর। সারাদিন ফেসবুকে পড়ে থাকিস আর এই সব সিম্পল ব্যাপার হ্যান্ডেল করতে পারিস না। দাঁড়া দুই কাপ কফি বানিয়ে আনি।

টুকু ভাবছে। সাদ জেনে গেছে। কিন্তু কতটুকু জানে। কিভাবে জানে। মোটকু টা এত ঢং করছে কেন। তার ফেক আইডির কথা কি জেনে গেছে? এখন কি হবে। মাথার মধ্যে চক্কর দিচ্ছে। সাদ ফিরে এসে টুকুকে কফির কাপ ধরিয়ে দিলো।

- শোন তোরা তো স্বীকার করিস না। চশমা পরা মোটা ছেলে গুলা বেশ বুদ্ধিমান হয়। আমিও অনেক বুদ্ধিমান। এখন তোর মাথায় ঘুরছে আমি কতটুকু জানি। আসলে আমি কিছুই জানিনা। সাদিক আমাকে বললো, দ্যাখ সাদ টুকুকে নিয়ে একটা ফেইক আইডি কি বাজে কথা লিখেছে। তারপর দেখলাম। এখন তোর মনে প্রশ্ন জাগছে সাকিব কিভাবে পেলো? আমরা আয়রন নিয়ে ডিসকাস করছিলাম। আর জানিস তো সাদিক হলো গুগল সার্চার। কথা বলার আগেই সে সার্চ দিয়ে বসে। বাংলায় রডের প্রকারভেদ লিখছে আর গুগল মামু সাজেশান দিলো গরম রড। একটা ফেসবুক আইডি। উইয়ার্ড বাট রসময় গুপ্ত টাইপ শব্দ। তাই কিউরিওসিটি থেকে সে চেক করে তোকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। আমার মনে হয় ক্লাসের বদ কোন ছেলে এটা করেছে।

ক্লাসের কারো সাথে তোর ঝগড়া হয়েছে রিসেন্টলি? গতমাসে আবিদের সাথে না কথা কাটাকাটি হলো। ভেবে দেখ তো। ধরতে পারলে শালার হাড়মাস সিদ্ধ করে দেবো।

- ভাবতে হবে না।আমি জানি কে করেছে। কিন্তু আমরা ওর কি করতে পারি?

- কি করতে পারি মানে! কোন জমানায় আছিস তুই? জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়বো। আমার মামা পুলিশ ইনস্পেকটর। নাম বল।

টুকু যতটুকু পারা যায় নিজের দিকটা সামলে সাদকে মোর্শেদের ঘটনা বললো। মনে মনে ভয় পাচ্ছে। তার ব্যাপারটা আবার না ফাঁস হয়ে যায়।

- হুম বুজছি। শালা চাইল্ড মলেস্টার!

এই অবস্থাতেও টুকুর হাসি পেলো।

- হা হা। আমাদেরকে কি তুই এখনো চাইল্ড ভাবিস নাকি?

- চাইল্ড নাতো কি। একটা ব্যাপার জানিস, এই তোরা যারা কিউটি টাইপ সে মেয়েই হোক আর ছেলেই হোক তোদের বোধবুদ্ধি একটু কম থাকে বলে আমার ধারণা। সব জায়গায় হয় ধরা খাইস না হয় মারা খাইস।

- দোস্ত মানলাম, পুলিশ মামা মোর্শেদের ব্যবস্থা করলো। কিন্তু ফেসবুকে এই জিনিসের কি ব্যবস্থা করা যায়।

- ধ্যুর এটা কোন ব্যাপার হলো? ফেসবুক আইডিতে ঢোক।

- কোন আইডিতে?

- কোন আইডিতে মানে! কতগুলা আইডি খুলছিস। তোর নিজের আইডিতে বাবা। ঢুকে ঐ ছবিটার বাম পাশে রিপোর্ট অপশান আছে। রিপোর্ট করতে পারিস?

- হ্যা পারি। আমি অনেকে ন্যুড পিক আপ দিলে রিপোর্ট করে দিয়েছি। পরে ফেসবুক সরিয়ে ফেলেছে ছবিটা।

- গুড। ওখানে গিয়ে দেখ হ্যারাসমেন্ট বলে অপশান আছে। ওটাতে ক্লিক কর। আর এবার মোটুর ম্যাজিক দেখ।

পরবর্তী আধাঘন্টা সাদ বেশ কিছু কাছের বন্ধুকে ফোন করলো ছবিটাতে রিপোর্ট করতে। সকাল হতেই কেল্লা ফতে।জুকু মামা ছবিটা সরিয়ে নিয়েছে এবং গরম রড আইডিটা ব্লক করে দিয়েছে বলে ফিডব্যাক মেসেজ পাঠিয়েছে। পুলিশ মামাও কম যায় না। মোর্শেদ থানা হাজতে। সাইবার আইন বলে একটা জিনিস আছে টুকুর জানাই ছিলো না। তাকে খুব বেশী কিছু করতে হয়নি। জাস্ট একটা বিবৃতি দিতে হয়েছে। টুকু এখন বুঝতে পেরেছে ফেক আইডিতে হাজারো বন্ধু থাকার চেয়ে রিয়েল আইডিতে সাদের মত একজন প্রকৃত বন্ধু থাকাই ভালো।

ক্রাশ

ঝমঝম করে বৃষ্টি নামলো। পুলক এক দৌঁড়ে গিয়ে কাছের বিল্ডিংয়ের সিড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বৃষ্টি ঝরেই চলেছে। থামার নামটি নেই। মোবাইল বের করে ক্লাশ অফ ক্লান খেললো। ধুর যা। ৩২% চার্জ ছিলো। শেষ। এখন বসে বসে মশা মারো। বসারই বা জায়গা কোথায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে এলো। কাহাতক আর বৃষ্টির অনাসৃষ্টি অত্যাচার সহ্য করা যায়। বৃষ্টিটাও ঝরছে রাগী মেজাজে। চটরপটর করে শব্দ তুলে। এই বৃষ্টিতে ভেজার কোন আনন্দ নেই। পিঠের উপর বেতের বাড়ির মত সপাটে আছড়ে পড়বে। মেঘ বাবুর আজ হঠাৎ মন খারাপ হলো কেন! রেইনি সিজনের তো ঢেড় বাকি। নাকি ম্যাচের আগে গা গরম করে নিচ্ছে।

গেটের উপর বাগানবিলাসের ঝাড়ের নিচে একটা ছাতা দেখা যাচ্ছে। ওহ গড, প্লিজ উয়ো ছাতাওয়ালোকো এই পথমে ভেজদো। হিন্দী সিনেমা দেখলে এরকম দু চারখানা বাংলামিশ্রিত হিন্দী পুলকও বলতে পারে। বাগানবিলাস নামটা রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। কবিগুরু এরকম বেশ কিছু ফুলের বাংলা নামকরণ করেছিলেন। এর ইংরেজী নাম বোগেনভিলিয়া। ইংরেজী হয় কিভাবে। ফরাসি পর্যটক বোগেনভিলের নামে নামকরণ করা হয়েছে এই ফুলের। কথাটা হঠাৎ মনে পড়লো কারণ যিনি ইনফোটি দিয়েছিলেন তার সুন্দর মুখখানা ছাতার নিচে দেখা যাচ্ছে এবং তিনি এদিকের পথেই আসছেন। পুলকের হার্ট একটা বিট মিস করলো। মিস করলো কেন! কারণ তো একটা আছেই। পুলক নিজের মধ্যে রংধনু সত্ত্বার উপস্থিতি অনেক আগেই টের পেয়েছিলো। সুন্দর চেহারার মানুষ তাকে মুগ্ধ করে। আর ঠিকই একই কারণে আরিফ স্যারের উপর ক্রাশ খেতে বাধ্য হয়েছে। স্যারের মধ্যে যেন চুম্বক আছে। অন্যান্য অনেক ক্লাস বোরিং লাগলে স্যারের ক্লাশ মনে হয় সংগীতময়। ম্যায় হু না সিনেমায় যেমন চাঁদনী ম্যাডাম থুক্কু সুস্মিতা সেনকে দেখে শাহরুখের মনে ভায়োলিন বাজতো পুলকের মনেও সেই একই পুলক জাগে। আরিফ স্যার ক্যামিস্ট্রির টিচার বাট উনি ক্লাসে ঢুকেই কোন না কোন একটা ইনফরমেশান দিয়ে ক্লাশ শুরু করবেন। এজন্য ছাত্ররাও বেশ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে যে স্যার আজকে কি বলেন। বোগেনভিলিয়ার কথাটা গত পরশু বলেছেন। স্যার যে কখন সামনে চলে এসেছে পুলক লক্ষ্য করেনি। স্যার আগে কথা বলায় থতমত খেয়ে গেলো।

- গুড ইভিনিং পুলক।
- গুড ইভিনিং স্যার।
- বৃষ্টি উপভোগ করছো মনে হচ্ছে!
- উপভোগ ঠিক না। না বলে আসা বৃষ্টিতে আটকে গেছি স্যার।

- বাহ তুমি তো বেশ কথা বলো। ক্লাসে এত চুপচাপ থাকো কেন। যখনি দেখি শুধু চেয়ে থাকো বাট রেসপন্স খুবই কম।

পুলক মনে মনে বলে রেসপন্স যে কেন কম তা যদি তুমি বুঝতে চান্দু। তোমার ওই মুখের দিকে তাকিয়ে আমি হাজার বছর এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। এত আকর্ষণ কেন তোমার। এত পার্সোনালিটি কেন তোমার।

- কোথায় যাবে?

- হোস্টেলে স্যার।

- চলো আমি তোমাকে পৌঁছে দেই।

- না স্যার আপনি আবার কেন কষ্ট করবেন। বৃষ্টি থেমে গেলে আমি চলে যাবো।

- আরে আমি বৃষ্টি দেখেই ছাতা নিয়ে বের হলাম। বৃষ্টিতে হাটতে ভালো লাগে। কতদিন পরে বৃষ্টি হচ্ছে। সেজন্য সুযোগটা মিস করলাম না। কাম অন।

পুলক আর গাইগুই করলো না। শেষে না সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যায়। এক ছাতার নিচে দুজন। আহা কি সিনেম্যাট্রিক। কোন সিনেমায় যেন এরকম একটা সিন আছে। মনে পড়ছে না। চুলোয় যাক সিনেমা।

- তোমার হোমডিস্ট্রিক তো শেরপুরে?

- জি স্যার।

- বাড়িতে যাবে কবে?

- আসছে সামার ভ্যাকেশানে। আচ্ছা স্যার আপনি এত ইনফরমেশন কোথায় পান?

- অনেকের অনেক শখ থাকে। আমার শখ বই পড়া। আমি প্রচুর বই পড়ি। এখন তো ইন্টারনেট হয়েছে। উইকিপিডিয়ায় অনেক নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

স্যার থামলেন। পুলকের বুকের ভিতরটা ধুকপুক করছে। বলার মত কিচ্ছু খুঁজে পাচ্ছে না। নিজের পাছায় নিজেই লাথি মারতে ইচ্ছে করছে। মনে মনে আরিফ স্যারের সাথে কত কথা বলে আর এখন কিনা মন বোবা হয়ে আছে। হারামজাদা মন, আজ তোর একদিন কি আমার একরাত! এরকম সুযোগ কি বারবার আসে। চরম রোমান্টিক পরিবেশ। আরে তুমি তো ভিজে যাচ্ছো বলে স্যার পুলককে কাছে টেনে নিলেন। ডানহাতে ছাতা ধরা। দুজনে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাম হাত খানা পুলকের কাঁধে তুলে দিয়েছেন। হায় রাব্বা। হাউ সুইট। পুলকের ইচ্ছে করছে ডান হাত দিয়ে স্যারের কোমরটা জড়িয়ে ধরতে। কাঁধে স্যারের বুকের স্পর্ষ লাগছে। আহ কি শান্তি। ঠোঁটখানা একটু উঁচু করে ধরলেই স্যারের ঠোঁটের সীমানায় পৌঁছে যাবে। এযেন ভারত পাকিস্তানের সীমানা। ম্যাকমোহন লাইন। কাঁটাতারের বেড়া। দুজনের কেউই এই সীমানা পার হতে পারছে না। আমি না হয় ছোট। এত দামড়া মদ্দ তুমি। সাহস করে একটু চুমু খাওনা। পুলকের চিন্তাধারা বিদ্যুৎ বেগে প্রবাহিত হচ্ছে।

- কি ব্যাপার। একদম সাইলেন্ট?

- ভাবছি।

- কি ভাবছো?

- একটা ব্যাপার।

- আমাকে শেয়ার করা যায়?

- হ্যাঁ।

- বলো।

- আচ্ছা স্যার পৃথিবীর সব দেশেরই একটা করে নাম থাকে। অফিশিয়াল নামটা অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ হয়। আবার অনেক দেশের সাবেক নাম থাকে। যেমন আমাদের বাংলাদেশের সাবেক নাম পূর্ব পাকিস্তান। তাহলে ভারতের কেন দুটো নাম। আর দুই নামেই কেন এবং কিভাবে ভারত পরিচিত হলো?

হারামজাদা মুখ। এ কি বললি তুই! তুই কি এতক্ষণ এই ভাবছিলি। আর কি এমন সুযোগ এই জীবনে পাবি!

- ভারতের দুটো নাম কেন প্রচলিত তা আমি এই মূহূর্তে ঠিক তোমাকে বলতে পারছি না। তবে দুটো নামের ইতিহাস তোমাকে বলতে পারবো। ভারতের প্রাচীন নাম ভারত এবং এই নামকরনের পিছনে একাধিক জনশ্রুতি আছে। কারো মতে পৌরাণিক যুগের সাগর বংশের সন্তান রাজা ভরতের নাম থেকে ভারতের নাম এসেছে। বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে মহাসাগরের উত্তরে এবং বরফে ঢাকা পাহাড়ের দক্ষিণে অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণে অবস্থিত দেশের নাম ভারতবর্ষ এবং এই দেশের মানুষকে অভিহিত করা হয়েছে 'ভারতসন্ততি' রূপে । ঐতিহাসিক ড: রামশরণ শর্মার মতে ভরত নামে এক প্রাচীন উপজাতির নাম অনুসারে এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে । কলিঙ্গ সম্রাট খারবেল-এর হস্তিগুম্ফা শিলালিপিতে 'ভারধবস' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় এবং এই নাম গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষ নামে খ্যাত হয়েছিল। এবার আসি ইন্ডিয়া কিভাবে হলো। অনেকে বলে থাকে গ্রীকরা সিন্ধুকে ইনডাস বলতো সেখান থেকে ইন্ডিয়া নামটি এসেছে। তবে জুল ভার্ণের দক্ষিণের যাত্রী উপন্যাসে ইন্ডিয়া নামকরণের একটি তথ্য দেওয়া আছে। টুয়েন্টিনথ মে ইন দ্যা ইয়ার অফ ফোরটিন্থ নাইনটি এইট বিখ্যাত পর্তুগীজ পর্যটক ভাস্কো দা গামা ভারতের কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছান। ভারতে এসে দেখেন এখানে প্রচুর নীল চাষ হয়। জাহাজ ভরে নীল নিয়ে গেলেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে এবং নতুন ভূখন্ডের নাম রাখলেন ইন্ডিয়া। তাই বলা যায় নীলের ইংরেজী নাম ইন্ডিগো থেকেই ইন্ডিয়া নামটি চলে এসেছে। এই যে বয়েজ হোস্টেলের গেট চলে এসেছে। তুমি এই হোস্টেলে থাকো।

- জি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।

- ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

ধুর। এত দ্রুত পথ ফুরিয়ে গেলো কেন! হারামজাদা পথ আরেকটু দীর্ঘ হতে পারলি না। যেদিন ক্লাসে দেরী করে ফেলি সেদিন তো মাইলখানেক লম্বা হয়ে যাস। স্যারটাও কি আমার আর কিছু জিজ্ঞাসু আছে কিনা জানতে চাইবে না।

স্যারের স্পর্শ পেয়ে যেমন ভালো লাগছে তেমনি অস্থির লাগছে। কিছু ভালো লাগছে না। পড়ার টেবিলে মন বসছে না। ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে স্যারের ফ্লাটে। কোন একটা পড়া বুঝে নেওয়ার ছুতো করে স্যারের কাছে গেলে হয় না! সেটা আবার বেশী হয়ে যাবে মন হয়। পুলকের রুমমেট এসে বারদুয়েক জিজ্ঞেস করলো, এভরিথিং অলরাইট? ইজ এনিথিং বদার ইউ?

পুলক দুদিকে ঘাড় দোলায়। কি বলবে। ধ্যুর। এ এমনি এক ফিলিংস না যায় কাউকে বলা, না যায় সহ্য করা। ‘পলাশ, ক্যান আই ইউজ ইউর ফোন?’

- ইয়েস ইউ ক্যান। বাট লিটল বিট শর্ট অফ ব্যালান্স।

- নো প্রব্লেম। আই ইউল টেক্সট টু কল অন দিস নাম্বার।

‘দাদা আমি পুলক, এই নাম্বারে কল ব্যাক করো আর্জেন্ট’।

যাকে টেক্সট করলো সে পুলকের আপন দাদা নয়। শুভ্র মোহাম্মাদ। ফেসবুকেই পরিচয়। কিছুটা খিটখিটে স্বভাবের মানুষ। সারাক্ষণ ফেসবুকে আলবালছাল বকে যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে হৃদয় ছুয়ে

যাওয়ার মত কথা বলে। অনেকটা বড় ভাইয়ের মত। এজন্যই তাকে পছন্দ হয়, আবার অপছন্দও হয়।

- হ্যালো পুলক।

- হ্যা দাদা আমি। আমি তো শেষ।

- হড়বড় করিস না। আস্তে ধীরে বল। তোর ফোন কই?

- ফোন বাড়িতে রেখে চলে এসেছি। এটা আমার রুমমেটের নাম্বার।

- কার প্রেমে পড়েছিস?

- বুঝলে কিভাবে?

- না বোঝার কি আছে। তোদের লাইনের লোক কিভাবে শেষ হয় জানা আছে।

- এত তোদের তোদের করো কেন? তুমি নিজে কোন লাইনের লোক শুনি। হু।

- আচ্ছা আচ্ছা। তা বল।

- ঠিক প্রেম না। ক্রাশ খেয়েছি।

- মালটা কে?

- আমার শিক্ষক।

- হুম নতুন কিছু না। সেক্সি মাল ক্লাসে স্যার হয়ে এলে ক্রাশ খাওয়াই যেতে পারে। আগে ছাত্র ম্যাডাম নিয়ে চটি লিখতো বিখ্যাত ফেসবুকিয় সাহিত্যিক গণ এখন ছাত্র শিক্ষক নিয়ে লিখবে।

- দাদা তুমি না! কোথায় আমাকে একটু গাইড করবে। তা না খোঁচাচ্ছো সেই প্রথম থেকে।

- আচ্ছা শোন। তার আগে আমার কথা বলি। আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে আমার এক টিচারের উপর ক্রাশ খেয়েছিলাম। তখন তো আর ক্রাশ ফ্রাশ টার্মের সাথে পরিচিত ছিলাম না। কিন্তু তাকে দেখলে আমার খুব ভালো লাগতো। তাকে ছুঁয়ে দেখতে খুব ইচ্ছে করতো।

- কখনো সুযোগ পাওনি?

- নাহ। সুযোগই আসেনি।

- প্রপোজ করোনি।

- ধ্যুর। অত সাহস থাকলে তো কবেই খেলে দিতাম। স্যার বিবাহিত ছিলো।

- এম্মা। তোমার রুচির নিকুচি করি।

- চুপ থাক। বড্ড বেশী বকিস তুই আজকাল। পাকনামো কম করে কর। ভালো লাগা কি এত বাছবিচার করে হয়। ভালো লাগা সম্পূর্ণ মনের ব্যাপার।

- স্যার কি তোমার ফিলিংস বুঝতো?

- আমার ধারণা বুঝতো। কারণ আমি লক্ষ্য করতাম স্যার কখনো আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। অন্য সবার সাথে কথা বলতো। কিন্তু আমাকে কিছু বলার সময়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে কথা বলতো।

- কেন?

- আমি ঠিক জানিনা। হিউম্যান সাইকোলজি বোঝার মত অত বড় মাথা আমার নেই। তবে এটুকু বুঝতাম আমরা দুজনেই দুজনের চোখের ভাষা বুঝতে পারতাম।

- তাহলে তো একজন প্রপোজ করলেই হয়ে যেত।

- মানব জীবন অত সহজ নয়রে ভাইডি। দেখা যেতো সে তার স্ত্রী সন্তানের কথা ভেবে পিছিয়ে গেলো। তখন আমাদের সম্পর্কটাই নষ্ট হয়ে যেতো।

- আমি কি তবে আমার স্যারকে বলবো না।

- সেটা তোর ব্যাপার। জীবনের কিছু সময় আসে, তখন নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ভালো হোক মন্দ হোক। অন্যের সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠকলে অন্যকে দোষারোপের সুযোগ থাকে। সেজন্য নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নে।

- আমার যে কিচ্ছু ভালো লাগে না দাদা। একদম পড়তে ইচ্ছে করে না।

- মালটা কি খুব সুন্দর।

- মোটামুটি। আহামরি নয়। তবে অসম্ভব পারসোনালিটি সম্পন্ন একজন মানুষ।

- দ্যাখ পুলক। তুই এখনো অনেক ছোট। সবে নটরডেমে ভর্তি হয়েছিস। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বি। তখন আরো সব লোকের সাথে পরিচয় হবে। আর তোর স্যারই যে তোর সাথে প্রেম করতে রাজি হবে তার গ্যারান্টি কি। একটা উদাহরণ দেই, বাগানে গিয়ে একটা ফুল পছন্দ হলো। তুই তুলে আনলি। বোতলে রেখে প্রতিদিন জল দিলি। কিন্তু ফুল তোকে ভালোবাসলো না। ভালোবাসলো মাটিকে। তাই দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগলো। এখানেও ব্যাপারটা সেরকম জলের বদলে তুই ভালোবাসা দিবি কিন্তু সে যদি কোন মেয়েকে ভালোবাসে? তখন কি হবে? তোদের দুজনের জীবনই জটিল হয়ে যাবে। তাই আমার মনে হয় তোর আরও সময় নেওয়া উচিত। ফুলটা না হয় ততদিন বাগানেই থাকুক। তুই মাঝে মাঝে তার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হলি।

- দাদা তোমার কথায় পয়েন্ট আছে। যদিও মানতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আমার হাতে আর অপশান নেই। আমার ক্যাচাল বাদ দাও। তোমার কথা বলো।

- ঐ রাখি রে। ফোনে আমি একদম কথা বলতে পারি না। সেই কখন থেকে গ্যাজাচ্ছি।

- রাখো তো তোমার কিপটেপনা। কল করেছো টাকা খরচ হচ্ছে এই জন্য সব খোঁড়া যুক্তি।
- যা তুই মুড়ি খা। আমি রাখলাম।
- ওকে বাই।
- বাই। ভালো থাকিস। খোদা হাফেজ।

নিরুদ্দেশ

'ভাই তোমারে আবার কবে যাতি হবে?'

চাচীর মায়ের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। অনেক দিন বাদে গ্রামে এসেছি। বছরের একবারের বেশী গ্রামের বাড়ি আসা হয় না। অফিস থেকে যে কদিন ছুটি ছাটা মেলে তাতে নিজের বাড়ি আসতে যেতেই শেষ। আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। বসন্তের কোকিল না ডাকলে বেশ চমৎকার একটা বাতাস বইছে। বাতাসে গরমের আভা। রৌদটাও পড়েছে সেরকম। চাচীর ঘরের বারান্দায় এসে বসে আছি। উঠোনে একপাল হাঁস মুরগী কলরব জুড়ে দিয়েছে। মুগ্ধ হয়ে এসব দেখছিলাম। এই ছোট ছোট জিনিসেও যে মুগ্ধ হওয়া যায় তা গ্রামের মানুষ এখন বুঝবে না। বুঝবে যখন বাড়ি ছেড়ে আমাদের মত অনেক দূরে চলে যেতে হবে। বারান্দায় ঝোলানো দড়ির দোলনায় হেলান দিয়ে নানী বসে ছিলেন। আমি বললাম,

- এই তো পরশু।
- মাত্র। আরো দুদিন থেকে যাও। এদ্দিন পরে আইলে
- কি আর করা বলেন।
- মানুষ সব পাইর মত হয়ে গেছে। আইকে এইহানে তো কাইলকে ঐহানে।
- আমার তো ইচ্ছে করে মাসে পর মাস এই গ্রামে এসে থাকতে।

- আইচ্ছা ভাই ঢাহা শহরের তে কইলকাতা কদ্দুর?

- কোলকাতা তো ঢাকার চেয়ে খুলনা থেকে কাছে। যাবেন নাকি?

- হ যাওয়ার ইচ্ছা আছে। ছাওয়াল কডারে কই, তা কেউ সুময় করে উঠতি পারে না। আমার বুন আছে না। যশোরে থাহে। সেইতি চিকিৎসের জন্য কইলকাতা গেলো। মাস তিনেক পরে আবার যাবে। আমারে নিয়ে যাতি চাইছে।

- কোলকাতায় কি করতে যাবেন? এই বয়সে এত জার্নি করে পারবেন।

- ছাওয়ালডারে একটু কইলকাতায় খুঁজে দেখতাম। পাই কিনা। য্যানে যাই আমি সব জাগায় খুঁজি। একদিন না একদিন খুঁজে পাবো।

নানী আঁচল টেনে তার ঝাপসা হয়ে আসা চোখ মুছলেন। ঘরের মধ্যে থেকে চাচীর গলা পাওয়া গেলো। "তুমি আবার সেই গল্প শুরু করেছো। থামো তো"।

হ্যাঁ। চাচীর কোন এক ভাই ছোটবেলায় বাড়ি থেকে চলে যায়। আর কখনো ফিরে আসেনি। গল্পটা আমি আগেও শুনেছি। সেভাবে শোনা হয়নি। সবাই হয়তো তার গল্প শুনতে শুনতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। কেউ আর শুনতে চায় না। এক গল্প বারবার পড়তে কার ভালো লাগে। আর সেরকম গল্প কি আর সবাই লিখতে পারে। মায়ের মন, হয়তো ছেলেটার গল্প বলতে ভালোবাসে। আমি তার মুখের দিকে চাইলাম।

- সেই মামা কতদিন আগে চলে গেছিলো নানী?

- তা মিলাদিন হবে। এই তুমার চাচীরা তহন কেলাস টু কি থ্রিতে পড়তো।

- তা ওনার বয়স কেমন ছিলো?

- চৌদ্দ পোনারো হবে।

চাচীর গলা আবার পাওয়া গেলো, চৌদ্দ পোনারো কেমন করে হয়। সাইজে ভাই যন বাড়িত্তে পুলায় গেলো তন তার বয়স ছেলো বাইশ বচ্ছর। আব্বার কাছে আমাগে সবাইর জন্ম তারিখ লিখা ছেলো।

- তা হবে হয়তো। আমার কি আর অত হিসেব টিসেব কত্তাম। চাইর ছাওয়াল আর পাঁচ মাইয়ে নে ঘর সংসার কত্তি কত্তি কবে যে এইরাম বুড়ি হয়ে গিছি তা নিজেই টের পাইনি। তার মদ্যি এট্টা ছাওয়াল গেলো হারায়ে। কিরাম কইরে যে বাইচে আছি তা আল্লাই জানে।

- তা উনি হারিয়ে গেলেন কিভাবে?

- রাগ করে বাড়ি থেকে চইলে গেছিলো।

- রাগ করে! কি নিয়ে রাগ করেছিলো? আর রাগ পড়ে গেলে তো বাড়ি ফিরে আসার কথা।

- হয়তো অনেক দূরে চইলে গেছিলো। লঞ্চে কইরে। তারপর এইরাম কোন ঘাটে নামিছে যে আর ফিরে আসার পথ খুঁজি পাতিছে না। পথে পথে ঘুত্তিছে।

- কিন্তু ওনার যা বয়স ছিলো তাতে তো বাড়ির পথ ভোলার কথা না।

- আমার এই ছাওয়ালডা খুব লজ্জা পাইতো। খুব লজ্জাশীল। অনেকটা মাইয়াগো মতো। মানুষের সামনে যাতি লজ্জা পাইতো। সমবয়সী ছাওয়াল পাওয়ালগে সাথে মিশতো না। খেলতি যাতো না। সারাক্ষণ বাড়ির মদ্যি থাকতো। বুনগে সাথে ঠুলা মালা নিয়ে খেইলতো। পড়শিরা দুই একজন ঠোঁট কাটা সুভাবের ছেলো। কইতো তোমার তো পাঁচ মাইয়ের জাগায় ছয় মাইয়ে হইছে মনে হতিছে। মনে মনে খারাপ লাগতো। কিন্তুক কি আর করা। আল্লাহ যেভাবে গড়িছে সেভাবেই তো হবে। আমাগে চাওয়ায় আর কি আসে যায়।

চাচীর ঝংকার শোনা গেলো, থামো তো মা।

কিন্তু নানির থামার কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করলাম না। মা হয়তো মায়ের দৃষ্টিভংগী থেকে সন্তানের গল্প করছেন। আমার চোখের সামনে একটি কৈশোর পেরোনো যুবকের মুখ ফুটে উঠলো। লজ্জা

লজ্জা ভাব। সমবয়সীদের সাথে মিশতে না পারা। অন্যদের কথা বার্তায় আহত হওয়া কিন্তু উত্তর দিতে না পারা। মেয়েলি কাজের প্রতি আগ্রহ থাকা। পড়শিদের কটু কথা, মুখ টিপে হাসা। ছেলেটার জন্য পৃথিবীটা জীবন্ত নরকই ছিলো। আমি নানীর দিকে তাকালাম। শূন্যদৃষ্টি মেলে উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই চোখ বাস্তবের কিছুই দেখছে না। তিনি এখন তার সন্তানকে দেখছেন। বেশকিছুক্ষণ নিরাবতার পর তিনি আবার চোখ মুছলেন।

- মামার নাম কি ছিলো নানী?

- শাহাবুদ্দি। শাহাবুদ্দিন গাজী।

- উনি কি স্কুলে যেতো না।

- মাদ্রাসায় ভত্তি কইরে দেলো তুমার নানা। কিন্তু মাদ্রাসার হুজুরেরা খুব মাইরতো বলে যাতি চাতো না। একসময় পড়া ছাইড়ে দেলো। মাইরধোর কইরে কাজ হইলো না দেইখে আমরাও একসময় থাইমে গেলাম। তহনকার দিনি তো মানুষ এত লেহাপড়া নিয়ে মাথা ঘামাতো না। কোনরহম হিসেব নিকেশ জানলি হতো। বড়ডাও তো পড়া ছাইড়ে গঞ্জের হাটে দুকান দিয়ে বইসলো মনিহারি জিনিসের।

- সেজ মামার কি হলো? কেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন?

- শাহাবুদ্দি যে কারো সাথে একদম মিশতো না তা কিন্তু না। তার একটা দোস্ত ছেলো। চ্যারমানের ছোট ছাওয়াল। বয়সে শাহাবুদ্দির তে তিন চাইর বছরের বড় হবে। নাম ছেলো মিলটন। গ্রামের মদ্যি এই চ্যারমানের ছাওয়াল পাওয়াল কডার নাম সব এইরাম ছিলো। তহনকার দিনে সব চেনা নাম রাইখতো মানুষ। এহন তো নাম শুইনে আর বুঝা যায় না কিডা হিন্দু আর কিডা মুসলমান। তহন যাইতো। মিলটনের সাথে শাহাবুদ্দির অনেক খাতির ছেলো। দুজন মিলে সারাদিন কুটুর কুটুর ফুটুর ফুটুর কইরতো। আমি এক একদিন জিজ্ঞেস কত্তাম কি নিয়ে কতা কইস তোরা এত। ছাওয়াল চুপ কইরে থাকতো। আমি মিল্টনরে কতাম, আমার ছাওয়ালডার লজ্জা ইকটু ভাইঙ্গা দাও। তোমার সাথে মেশে তুমি ওরে বুঝাও। ইরাম কইরে কদ্দিন চলতি পারবে।

মিলটন আমারে কইতো, চাচীজান তুমি একদম চিন্তা করবা না। তুমার ছাওয়াল অন্য সবার থেকে ভালো। মিলটন আর শাহাবুদ্দি মিলে গাঙের চরে গোলপাতা আর কেওড়ার গাছের জঙ্গল হইয়ে ছেলো। কেওড়া গাছে উঠে পা ঝুলায় দুজন বইসে গল্প কত্তো। সন্ধ্যা হয়ে যাতো। ফেরার নাম কত্তো না। আমি রাস্তায় গে ডাইকে আনতাম। একেকদিন শাহাবুদ্দি মিলটনগে বাড়ি শুতে যাতো। তহন তো বাড়িতে একখান ঘর। শোয়ার জাগার কষ্ট ছেলো। হঠাৎ শুনি মিলটনের বে ঠিক হইছে। চ্যারমানের টাকা পয়সা ছেলো শিরাম। দশগাঁয়ের লোক দাওয়াত দেলো। মাইঝে ছাওয়াল রাইখে ছোট ছাওয়াল বে দিতি উঠে পড়ে লাইগলো ক্যান চ্যারম্যান বুঝলাম না। আমাইগে ষোলো আনা দাওয়াত দেলো। বে'র দিন সকালে মিলটন আইছিলো শাহাবুদ্দিরে বরযাত্রী নিয়ে যাবে বইলে। শাহাবুদ্দি কিছুতেই যাতি রাজি হইলো না। মিলা মানষির মদ্যি সে যাতি চায় না। পরদিন বৌভাত। আমরা সবাই গিলাম খাতি। শাহাবুদ্দিরে একরম জোর করে ধইরে নে গেলো ভাইবুনিরা মিলে। চুপচাপ বইসে থাকলো। ব্যাপারটা তোমার নানা খেয়াল করিছে দেখলাম। সে কইলো দোস্তর বিয়ে হয়ে গেছে বইলে তারও বিয়ে কত্তি মনে চাতিছে। কিন্তু লজ্জার কারণে কতি পাত্তিছে না। ওরে কইয়ো মন খারাপ না কত্তি। বড়ডার তো বিয়ে হইয়ে গেছে। মেঝো আর সেজোডার বিয়ে একসাথে দেবো সামনের পইষ মাসে। ধান চাল উঠুক। শাহাবুদ্দিরে বে'র কথা কলাম। খুশি হলোই না। মন মরা ভাব আরো বেশী বাইড়ে গেলো। পইষ মাস পড়ার আগেই ঘটক বের সমন্ধ আইনে হাজির। দুদিন করে দু বাড়িতে মাইয়ে দেখতি গেলো তুমার নানা আর বড় মামা। তহনকার দিনে এত দেহাদেহির ঝক্কি ছেলো না। বাপে গে দেইখে পছন্দ হইছে কলি ছাওয়ালেরা বিয়ে কত্তো। মাইঝে ছাওয়াল বিয়ে কতায় খুশী তা তার মুখ দেখলি বুঝা যাতো। সেজডার ভাবগতিক কিছুই বুঝিনে। একদিন ডাইকে পাশে বসায়ে মাথায় হাত বুলায়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হইছে, মাইয়ে তোর পছন্দ হয়নি? সে কিচ্ছু বলে না। বে'র দিন তারিখ পাকা হয়ে গেছে। বে'র সপ্তাহ খানেক আগে শাহাবুদ্দি কয় সে বে করবে না। শুইনে তোমার নানা গেলো খেইপে। এত্তবড় ছাওয়াল ধইরে মাত্তি যায়। বে কি ছেইলে খেলা নাকি। আগে কতি কি হইছিলো। এখন কোন কারণ ছাড়া বে ভাইঙ্গে দিলি মানষি কি কবে। আর যে মাইয়েডার বে ভাঙ্গে যাবে লোকে তারে কি নিন্দামন্দ করবে সে কথা একবার ভাইবে দেখিছিস বলদ। তোমার নানা তারে ইচ্ছে মতো

গালাগালি করলো। আমি থামাতে গেলাম। আমারেও থাপ্পড় মারলো। তোর জন্যই তো এই মাইয়া মুখো ছাওয়াল হইছে। মানুষটার মাথায় রাগ উঠে গেলে হিতাহিত জ্ঞান থাকতো না। সে রাত্তিরে শাহাবুদ্দি ভাত খাইলো না। তখন ছোট ছাওয়াল হয়নি। মাইঝে আর সাইজে ছাওয়াল এক সাথে শুতো। মাইঝে ডাইকে কয় ওমা শাহাবুদ্দি কই? ফজরের পরের তো আর দেখতিছিনে। পায়খানা কত্তি যাতিছে কইয়ে কনে গেলো। আমার মনে কুডাক ডাকলো। আমি ছুটে ব্যাড়ে গেলাম, পইরপাড়ে গেলাম, গাঙের চরে গেলাম। কোনজাগায় শাহাবুদ্দি নেই। তোমার নানা বাইর হইয়ে আইছে, আশপাশের সব মানুষ বাইর হইয়ে আসলো। গেলো কনে ছাওয়ালডা। কেউ দেখে না সুকাল থেকে। এইরাম সময়ে লঞ্চ ঘাট ইজারা নিছিলো রশিদ গাজী। সে আইসে কইলো আরে তুমাগে শাহাবুদ্দি তো রাত চাইরটার লঞ্চে উঠলো। খুলনার দিকে যেটা যায়। নীল ডুমুর লঞ্চ। আমি জিজ্ঞেস করলাম কনে যাতিছিস। তা কোন কতা কইলো না। কি হইছে। আমি ডুকরে কাইন্দে উঠলাম। কিন্তু সেই কান্না আজো ফুরাইলো না। তোমার নানা সকাল আটটার লঞ্চে খুলনা গেলো। য্যানে য্যানে খুঁজা যায় সব খানে খোঁজ কইরলো। কোন জাগায় খুঁজে পাইলো না। ছাওয়ালডা আমার রাগ কইরে চইলে গেলো। কি দরকার ছেলো মানুষটার অত কঠিন হওয়ার। বে না করলি কি হতো একটা ছাইলে। ছাওয়ালডা আমার ভাত না খেয় বাড়িততে চলে গেলো। আল্লাগো। আমার ছাওয়ালডা তুমি ফিরায়া দাও। মরার আগে ওর মুখটা আমি একবার দেখে যাতি চাই।

নানী শব্দ করেই কাঁদছেন। বুকের গভীরে চেপে রাখা কান্না বেরিয়ে আসছে জল হয়ে। চাচী বেরিয়ে এসেছেন। তার চোখের জল। মা কে তিনি ধরে বললেন, ওঠো কাইন্দো না। আসরের আজান দেওয়ার সময় হইছে। ওযু কইরে আসো। আল্লাহর কাছে কান্দো। সেই ফিরাই দেবে তোমার ছেলেরে।

- আর কত কানবো মা। কম তো কানলাম না। তোরাও মাইয়ে বে দে দিলি। আমারে আর কত্তদিন অপেক্ষা করে রাখবে আল্লা। আমার নিরুদ্দেশ ছাওয়ালডারে ক্যান ফিরায়া দেয় না আল্লা।

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। বিকেলের রোদের তেজ মরে আসছে। নানী, তোমার শাহাবুদ্দি মাদ্রাসা পালানো ছেলে। আজকের শাহাবুদ্দিরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করার পরেও তারা মনের গহন কোনে লুকোনো সত্য প্রকাশের সাহস পায় না। তোমার শাহাবুদ্দিনের মত এরাও পালিয়ে যাওয়ার অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে বেঁচে আছে বছরের পর বছর। শাহাবুদ্দিনেরা কখনো মরে না নানী। এরা বাঁচে। যুগ যুগ ধরে বাঁচে। জীবন্মৃত হয়ে বাঁচে। পালিয়ে বাঁচে। নিরুদ্দেশ এই বেঁচে থাকা আরো কত যুগ চলবে নানী আমার জানা নেই।

পথের বাঁকে

-ভাইয়া কিছু লাগবে?

ঢাকা শহরে মামা ডাকের প্রচলন বেশী। হঠাৎ ভাইয়া ডাক তাও খুলনা অঞ্চলের টানে, আমি ফিরে তাকালাম। আট দশ বছরের একটা ছেলে। পরণে ফুল পাতা আঁকা শার্ট, রংচটা থ্রি কোয়াটার প্যান্ট ময়লাটে হয়ে আছে। ঘড়িতে আটটা, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। বহুদিন ঘড়িই ব্যবহার করা হয় না মোবাইল আসার পর থেকে। প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরার পরে রমনা পার্কে হাঁটতে আসা অভ্যেষে পরিণত হয়েছে। আমি অবশ্য ব্যায়াম করা টাইপ পাবলিক নই, নই ফিগার সচেতন।

সেরকম বডিও নেই। একেকজনের একেকটা শখ থাকে। কেউ লিখতে ভালো বাসে, কেউ পড়তে, কেউ খেতে আর কেউবা ঘুরতে। আমার ভালো লাগে মানুষ দেখতে। বড় অদ্ভুদ কিছিমের শখ। আর রমনা পার্ক বিচিত্র ধরণের মানুষের মিলন মেলা। জগিং করতে আসে কেউ, ফেরীওয়ালা, চাওয়ালা, হাঁটতে আসে, বসতে আসে মানুষ, অলস শুয়ে থাকা মানুষ, রাতের বেলা দেহপসারিনীদের চাহনি, গার্ডদের ভাবলেশহীন হেটে যাওয়া সব কিছুর মাঝেই আমি আনন্দ খুঁজে পাই।

বাচ্চা ছেলেরা এসে খুব উৎপাত করে। মামা ড্রিংক্স লাগবো, মামা সিগ্রেট লাগবো, মামা চা-কফি খান। একদম কানের পোকা বের করে ফেলে। তাই সন্ধ্যা পার হলেই আসি। তখন এদের উৎপাত কমে যায়। আজকে এমনিতেই লোকের সমাগম অন্যদিনের তুলনায় কম মনে হচ্ছে। আমি ছেলেটার দিকে ফিরে বললাম, কি আছে তোর কাছে?

ছেলেটার মুখে হতাশ ভাব ফুঁটে উঠলো। 'আপনি বুঝতে পারেন নি'?

- কি বুঝবো?
- যাউকগা। যাই অন্য কোথাও দেখি।
- আরে শোন শোন।
- ফাউ প্যাঁচালে কাম নাই ভাই। আমার এই করেই দিন চলে। ধান্দা করতে হয়।
- খুলে বল। পার্কে এসেছি। বুঝতেই পারছিস। অতটা সাধু সন্যাসী টাইপ নই।
- আমি চুষি। চুষাবেন? পঞ্চাশ টাকা আউট করা পর্যন্ত। আর লাগাইতে চান। তাহলে একশো টাকা।
- বস। এখানে। পঞ্চাশ টাকা দেবো। আমার সাথে বসে গল্প কর কিছুক্ষণ।

- আমার টাইম নষ্ট কইরেন না। প্যাঁচাল পাড়া শেষ কইরা বলবেন যে কিয়ের টাকা। মানুষ খুবই খারাপ। কতদিন হইছে করার পরে টাকা দেয় নাই। চেঁচামেচি করলে থাপ্পড় লাগাইছে। কাউরে কিছু কইতে পারি নাই। কইলে তো উলটা তারা আমারেই দুষবো। যে চোষায় তার দোষ নাই। যে চোষে সব দোষ তারই য্যান।

- আচ্ছা আমি তোকে পঞ্চাশ টাকা দিলাম। কিন্তু পাঁচ মিনিট পরে যে তুই উঠে যাবি না তার গ্যারান্টি কি?

- জীবনের গ্যারান্টি নাই। আপনেরে ক্যামনে গ্যারান্টি দিমু। আইজকা কাস্টমার পাইতাছি না। আজকে মনে হয় কারো রস বেরোনির লাইগা উথাল পাথাল করতাছে না। বসলাম না হয় আধাঘন্টা।

পকেটে অনেকগুলো পঞ্চাশটাকার নোট। বললাম, চকচকে নোট নিবি নাকি?

- দ্যান যা দিবেন। চকচকে লইয়া করুম ডা কি? সাজাইয়া রাখুম? তাইলে খামু কি?

- কেন তোর কেউ নেই?

- আছে। সব আছে। মা আছে, বড় ভাই আছে, ভাবী আছে। কিন্তু তারা কেউই আমার নেই।

- কোথায় তারা?

- সে এক লম্বা ইতিহাস।

- সেটাই শুনতে চাচ্ছি।

- আরো পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

- নিজের গল্প বিক্রি করবি?

- সব বড় বড় ল্যাখকেরাই তাই করে। বিনি পয়সায় লেখেডা ক্যাডা? ঐযে ঐপারে বইমেলা হয়। ঐখানে যাগো লেখা গল্প বিক্রি হয় তারা তো নিজেদেরই গল্প বিক্রি করে পয়সার জন্যি। আমি করলে কি দোষ!

- তাহলে বল। কিভাবে এলি এই পথে? তোর বাড়ি মনে হচ্ছে খুলনা?

- ক্যামনে বোঝলেন স্যার? খুলনা না। সাতক্ষীরে।

- ওহ সাতক্ষীরা। কাছাকাছি। তাই ভাষাটাও একই রকম। আমার বাড়ি খুলনা।

- খুলনা। খুলনার কনে?

- খুলনার কোথায় চিনিস? আর আমার বাড়ি দিয়ে কি হবে! তোর গল্প শোনার জন্য কিন্তু পয়সা দিচ্ছি। আর আমাকে স্যার বলতে হবে না।

- আমার গল্প খুব অল্প ভাই। যখন আব্বা বাইচে ছিলো তখন আমাদের অনেক সুখের দিন ছিলো। আব্বা রিস্কা চালাতো সাতক্ষীরে টাউনে। সন্ধ্যাবেলা ফিরবার সময় বড় বড় মাছ কিনে আনতো। আমার জন্য মিষ্টি কিনে আনতো। আমি তহন প্রাইমারী স্কুলে যেতাম। সব ভালো চলতেছিলো। একদিন মা কানতে কানতে কইলো আব্বারে ট্রাকে চাপা দিছে। হাসপাতালে ভর্তি করছে। আমরা হাসপাতালে ছুইটা গেলাম। বারান্দায় আব্বারে ফালায়া রাখছে। এক তাল মাংস য্যান। রক্ত আর রক্ত। তহনো নড়তাছে। বৈকেল বেলা আব্বা মইরা গেলো। রাত্রেই গোর দিয়ে দিলো। এরপর আমাগে খুব কষ্ট হচ্ছিলো চলতে। বড় ভাইয়ের বয়স তহন চৌদ্দ কি পনেরো। এক গেরাজে কাম করতো। টাহা পয়সা সব নেশা কইরা উড়াইতো। খাওয়ার কষ্ট সহ্য করতে না পাইরা মা আবার নিকা করলো সদরুল ডেরাইবাররে। আমারে সাথে নিয়া গেছিলো। প্রথম কদিন কিছু কয় নাই। একদিন মারে কইলো, তুমারে বে করছি। ভালো কথা। কিন্তু আমি ঐ আইজ্জার আওলাদরে পালতে পারুম না। ওরে বিদায় করো।

মা আমারে বিদায় করে নাই। সদরুল হারামি আছিলো। আমারে মারতো। মারে মারতো। আমি ভাইয়ের কাছে চইলা গেলাম। ভাই দেখি নিকা করছে। ভাবী দেখতে খুবই সুন্দর। সারাক্ষণ সিনেমার নাইকাগো লাহান সাইজাগুইজা থাকে। কিন্তু ব্যাভার শিরাম খারাপ। আমারে খাইতে দিতো না। ভাই দেইখাও দেখতো না। আইজ থেকে তিন বছর আগের কথা। অনেক ছোটো ছিলাম। কেউ কাজে নিতো না। এক চার দোকানের ছিলাম। সে মাইনে দিতো না। শুধু খাইতে দিতো। একজন কইলো খুলনা শহরে গেলি মাইনে দেবেনে। সাহস করে চলে গেলাম খুলনা শহরে। কিন্তু কাজ পাইলাম না। সারাদিন ঘুরলাম। কেউ নিতে চায় না। সবাই দুরদুর করে খেদায় দেয়। রাইত অনেক হইছিলো। ট্রাক স্ট্যান্ডের পাশে শুইয়া ঘুমাই গেছিলাম। হঠাৎ মনে হইলো কারা য্যান মুখ চাইপা ধইরা আমারে কই নিয়া যাইতাছে। এক খালি ট্রাকের উপর নিয়া আমারে প্রথম লাগাইছিলো ওরা। চারজন ছিলো। অনেক ব্যাথা পাইছিলাম। অজ্ঞান হইয়া গেছিলাম। রক্তও বাইর হইছিলো। রাস্তায় ফালায় রাইখা চইলা গেলো। ব্যাথায় আমি নড়তে পারি না। কারা য্যান আমারে খুলনা মেডিক্যালে ভর্তি কইরা দিছিলো। এরপর আমি শিখা যাই ডেরাইবার রা টাকা দিয়া এই কাম করে। প্রথম প্রথম কষ্ট হইতো। এরপর অভ্যেষ হইয়া গেলো। একবারে একশো টাকা। অনেকে আছে পরপর তিনবার লাগায়। দুইশো টাকা দেয়। সব ব্যাবসাতেই কমিশন দিতে হয় ভাই।

- তা ঢাকা এলি কিভাবে?

- ঢাকা ক্যান ভাই! আমি পুরা বাংলাদেশ ঘুরছি।

- কিভাবে?

- ঐ যে ট্রাক ডেরাইবাররা আছে না। সব ডেরাইবার ইরহম না। কিন্তু আমি দ্যাখলে বুঝতে পারি কারা কেমুন। তাগো কই আমারে ঢাহা নামাই দিয়ো। নামায় দিয়া যায়। তয় ফ্রিতে তাগো শখ আহ্লাদ পুরন করতে হয়। এই কবছরে আমি বরিশাল গেছি, রংপুর গেছি, রাজশাহী গেছি, চট্টগ্রাম গেছি, ককশোবাজার গেছি, বান্দরবান গেছি। যাইনি কোথায়। আমার আর কিছু দেখতে

বাকি নেই ভাই। পাহাড়ের উপর দাঁড়ায়ে সুয্য উঠতি দ্যাখলাম। আসলেই দেখতি সুন্দর। আল্লা এত সুন্দর কইরে বানাইছে আমাদের দ্যাশটারে। না দেখলি বুঝবা না। সব দেখছি আমি। কিন্তু ঢাকা শহরের বড় বড় হোটেলগুলোর মদ্যি দেখতি পালাম না। আমারে ঢুকতেই দেয় না।

- চল।

- কনে?

- আমি তোমাকে একটা বড় হোটেলের ভিতর দেখাবো।

- আমারে ঢুকতে দেবে না।

- এই পোষাকে দেবে না। আগে চল তোর জন্য এক সেট কাপড় কেনা যাক। মার্কেটের সব দোকান হয়তো এখনো বন্ধ হয়নি। জলদি চল।

ছেলেটার চোখে অবিশ্বাসের চাহনি। আমাকে হয়তো পাগল ভাবছে। সুযোগ না নিয়ে তার জন্য এটা কেউ করতে পারে। সে শুধু জানে এই পৃথিবীতে কিছু পেতে হলে তাকে দিতে হবে। তার যেটুকু দেওয়ার আছে সেটুকুই দিচ্ছে। কিন্তু অন্য আর দশজনের থেকে সে আলাদা। অন্যেরা তো এভাবে টাকা আয় করে নেশায় বুদ হয়ে থাকে। শিশু দেহব্যবসায়ী আমি আরো দেখেছি। অল্প বয়সেই সব হেরোইন ফেনসিডিলে আসক্ত হয়ে যায়। আর এ আসক্ত হয়েছে বেড়ানোয়। নিজে থেকেই কখন একজন ইবনে বতুতা হয়ে গেছে সে নিজেও টের পায় নি। ইবনে বতুতার কথা ওকে বলে লাভ নেই। ও বুঝবে না। যদি লিখতে পারতো তবে ওর এঙ্গেল থেকে বর্ণনা করতে পারতো জীবনকে, বলতে পারতো কেমন দেখেছে সে তার বাংলাদেশকে।

বাবা

রক্তজবার মত লাল টুকটুকে সূর্য্যটা আস্তে আস্তে বৃক্ষসারির মাথার উপরে মুখ তুলছে। সবুজ ঘাসে ভোরের স্নিগ্ধতা। আসিফ জগিং করতে করতে পেছনে ফিরে দেখে বাবা বেঞ্চের উপরে গিয়ে বসেছে। আসিফ পেছনে ফিরে গেলো। বাবার পাশে বসে পড়লো।

- কি ব্যাপার আব্বু! আজ এক পাঁক ঘুরেই বসে পড়লে।

- বয়স হয়েছে। অল্পতে হাঁপিয়ে যাই। আমি বসি। তুমি দৌঁড়াও।

- না আমিও কিছুক্ষণ বসি। ওকি জুতো খুলছো কেন। ঘাসের শিশিরে পা দিচ্ছো। ঠান্ডা লেগে যাবে।

রশিদ সাহেব ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বাবাছেলের সম্পর্ক ছেলেবেলা আর বুড়োবেলায় একদম উলটে যায়। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণ গল্পের মত। ছেলে বাপের ভূমিকায় যায় আর বাপ ছেলের। আসিফ বাবার হাত খানা ধরে। নিঃসংকোচে। অথচ এক সময় এই হাত খানাই দূরে সরে গেছিলো। অনেক দূরে। একলা ঘরে কত নিঃসংগ বিকেলে কেটে গেছে। এখন যেমন অফিস থেকে ফিরে টেবিলে বসে ঝিমুতে শুরু করলে বাবা মাথায় হাত রাখে। তখন হাত রাখার কেউ ছিলো না।

তিন ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে বাবা মা তাদের জগৎ সাজিয়েছিলো। আসিফ ছিলো মেজো। বড়ভাই ব্যাংকে চাকরি করে। আসিফ সবে পড়াশোনা শেষ করে একটি এনজিওতে ঢুকেছে। বিসিএসের চেষ্টা করছে। বিসিএস প্রসেস এত জটিল যে আসিফ আশাই ছেড়ে দিয়েছিলো। বড়

ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে বছর তিনেক। আসিফের চাকরি বছর দেড়েক হলে মা মেয়ে দেখার জন্য আত্মীয় স্বজনকে বলা শুরু করলেন। আসলে বলা উনি অনেক আগেই শুরু করেছেন। আসিফকে মা পিড়াপিড়ি শুরু করলেন মেয়ে দেখতে যাওয়ার জন্য। আসিফ বুঝেছিলো মেয়ে বাড়ির সবারই পছন্দ। ছবি দেখেছে। মেয়েকে না বলার কিছু নেই।

রাতে আসিফ মায়ের ঘরে গেলো। মা চোখে বাবার চশমাখানা এটে বড় ভাইয়ের বাচ্চার জন্য কাঁথা সেলাই করতে বসেছেন। সে মায়ের পাশে গিয়ে বসলো।

- এখনকার দিনে কি আর এসব কাঁথা সেলাই করার যুগ আছে। বাজার থেকে কিনে নিলেই হলো।

- নাতি নাতনীর জন্য কাঁথা সেলাই করা যে দাদী নানীদের জন্য কত আনন্দের তা তুই কি বুঝবি। এখন তো এক ছেলের ঘরে বাচ্চা আর কয়দিন পরে দুই ছেলের বাচ্চা সামলে আমার দিন চলে যাবে।

- মা একটা কথা বলবো।

- বল।

- জানিনা কথাটা তোমরা কিভাবে নেবে।

- কি এমন কথা।

- মা আমি ঠিক করেছি আমি বিয়ে করবো না।

মা আসিফের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। কি বলা উচিত তার ভেবে পেলেন না। বেশ কিছুক্ষন নিরবতার পরে মুখলেন,

- পাগল ছেলের কথা শোনো। বিয়ে করবে না। তাই হয় নাকি। আমি আর কয়দিন। বিয়ের পরে বউ এসে তোর দ্বায়িত্ব বুঝে নিক।

- মা আমি কিন্তু সিরিয়াস।

রশীদ সাহবে কথাটা শুনে রেগে গিয়েও সামলে নিলেন। ছেলেকে যথাসাধ্য বোঝানোর চেষ্টা করলেন, আসিফ, জীবন থেকে পালিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না। প্রথাগত পদ্ধতিকে অবহেলা করে তুমি একলা বাঁচতে পারবে না।

এরপর কতদিন চললো একে অন্যকে বোঝানোর পালা। এ ওকে বোঝায় কিন্তু কেউ কারো অবস্থান ছাড়ে না। আসিফের কষ্ট লাগলো, বাবা মা কিছুতেই তাকে বুঝতে চাচ্ছে না, সামাজিক সম্মানটাই তাদের কাছে বড় হয়ে গেলো। লোকে কি বলবে সেটাই তাদের কাছে বড় হয়ে গেলো। অন্যদিকে বাবা মা কষ্ট পাচ্ছেন, তারা কি ছেলের মন্দ চায়। সারাজীবন এই ছেলে একলা কিভাবে কাটাবে। আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যেই সামনে পড়তে লাগলো সেই আসিফকে বোঝানো শুরু করে। আসিফের চারপাশ জটিল থেকে জটিলতর হতে শুরু করলো। পারিবারিক সম্পর্ক অবনতি হলো। বোঝানো এখন ঝগড়ায় পরিনত হলো। একদিন আসিফ ব্যাগ গুছিয়ে বাড়ি থেকে চলে গেলো। বাড়ির লোকে ভেবেছিলো থাকুক ছেলে একলা কদিন। একলা থাকার ভূত মাথা থেকে বের হলে ঠিকই ফিরে আসবে। আসিফ ভেবেছিলো একলা জীবনই তো চেয়েছে। পিছের বাঁধন সব যদি কেটে যায় যাক না। বদলি হয়ে সে খুলনা থেকে ঢাকা চলে গেলো। হেড অফিসে। অনেক কাজের চাপ। সময় কিভাবে চলে যাচ্ছিলো সে কিছুই টের পাচ্ছিলো না।

বছর খানেক বাদে একদিন বাড়ি থেকে ফোন এলো। সে যেন এখনি বাড়ির পথ ধরে। বড় ভাইকে কারণ জিজ্ঞেস করতে জানালো এত কথা বলার সময় নয়। তার উচিত এখনি রওনা দেওয়া। সে তখনি বেরিয়ে পড়লো। বাড়িতে পৌঁছালো তখন উঠোনে একগাদা মানুষের ভিড়।

সবাই তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। কেউ কিছু বলছে না। বোনটা ছুটে এসে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

- ভাইয়ারে। ভাইয়া গো। আম্মা আর নেই। আল্লা গো। তুমি আমার আম্মারে ফিরায়া দাও।

আসিফের জগৎটা হঠাৎ কাঁপতে শুরু করলো। মনে হচ্ছিলো সে পড়ে যাচ্ছে। কেউ একজন তার হাত ধরে খাটিয়ার কাছে নিয়ে গেলো। মায়ের পুরো দেহ কাফনের কাঁপড়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। কে যেন বললো, মুখটা খুলে দাও। শেষবার মায়ের মুখটা দেখুক।

কেউ একজন বললো, আপনারা বেগানা পুরুষেরা সরে যান সরে যান। বারান্দা থেকে বাবার ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেলো, জালেম। মায়ের মুখ দেখতে আসছে। দেখাও দেখাও। বেশী করে দেখাও ওরে। ওর জন্যই চিন্তা করতে করতে রাহেলা শেষ হয়ে গেছে। না হলে এই বয়সে হার্ট এট্যাক কেন করবে।

হার্ট এটাকের কোন বয়স নেই। বাবার সাথে অন্যসময়ে এই বিষয়ে তর্ক করা যেতো। মায়ের মুখ দেখার পরে আসিফের বুকের ভেতরটা যেন মুচড়ে উঠলো। বহুদিনের চাপা কান্না যেন এক সাথে বেরোনোর জন্য হুড়াহুড়ি শুরু করে দিলো।

জানাজা, দাফন শেষে সবাই একে একে ফিরে গেলো। আসিফ গোরস্থানে চুপচাপ বসে রইলো। মা, তোমার পাশে এভাবে চুপচাপ বসে থাকার জন্য কতদিন মন কেঁদেছে। একবার কেন ডাকলে না মা। অভিমান করেছিলে। বাবাকে ভয় পাচ্ছিলে। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো না। আসিফের কান্না কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। বড় ভাই এসে কাঁধে হাত রাখলো। চল বাড়ি যাবি। বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে সে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। বড় ভাইও কান্নার বেগকে সামাল দিতে পারলেন না। এতক্ষন পাষানে বুক বেঁধে সে সব দিকে খবর রাখছিলো।

বড় ভাই চাকরি করে। ছোটটাও চাকরিতে ঢুকেছে। চারদিন পরে মায়ের চল্লিশা। বাড়িতে আসিফ আছে।। প্রয়োজনে সবাই কথা বলছে। মায়ের অকালে চলে যাওয়ার জন্য সবাই যেন তাকে দোষারোপ করছে। কিন্তু মুখ ফুঁটে কেউ কিছু বলছে না। বাবা তো মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন। রাতে সে বাবার ঘরে গেলো। বাবা দেখেও দেখলেন না।

- বাবা।

- তুমি কেন এ ঘরে এসেছো। অনেক কথা হয়েছে। আর নয়। যে কয়দিন থাকতে ইচ্ছে করে থাকো। তারপর চলে যাও। একলাই তো থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছো। তোমার তো বাবা মা ভাই বোনের দরকার নেই। আমাদেরও তোমাকে দরকার নেই। আমাদের কষ্ট আর বাড়িয়ো না।

না। আসিফ আর থাকেনি। মায়ের চল্লিশা শেষ হলে সে বাড়ি থেকে চলে এলো। কাউকে বলা হলো না। তার সরকারী চাকরি হয়েছে। বিসিএস প্রশাসন। মা শুনলে কি খুশী হতো। সারা পাড়ায় মিষ্টি বিলাতো। বাবাকে বলতো জুম্মাবারে মসজিদঘরে মিলাদ দিবা কিন্তু। কাউকেই বলা হলো না।

বারো বছর কেটে গেলো। আসিফের বয়স এখন একচল্লিশ। জীবন কেটে যাচ্ছে একরকম। কোন পিছু টান নেই। বাড়ি বলে কিছু ছিলো কোন কালে আজকাল সেটা আর মনে পড়ে না। বাড়ির কথা মনে পড়ছে কারণ অফিসের কাজে তাকে খুলনা যেতে হচ্ছে। কত্তদিন পর। অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে খুলনা। সার্কিট হাউসে আজ রাতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। ভাবছে আগামীকাল অফিসের কাজ শেরে বিকেলের দিকে বাড়ির পথ ধরবে। কেউ তাকে না চাক। মায়ের কবরখানা জিয়ারত করে আশা যাবে।

খুলনায়ও নাকি আজকাল বৃদ্ধাশ্রম হয়েছে। আসিফের জানা ছিলো না। সমাজ সেবা অফিসের এক প্রোগ্রাম আছে মুজগুন্নীর বৃদ্ধাশ্রমে। কি যেন নাম। ফাইল দেখতে হবে। হুম বাবার সাথে আসিফের দেখা বৃদ্ধাশ্রমেই হয়ে গেলো। এক থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপচাপ কাঁদছিলেন। আসিফ তখন

মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষন দিচ্ছিলো। এত মানুষের ভিড়ে থামের আড়ালের মানুষটির দিকে চোখ পড়ার কথা ছিলো না। পড়লো না। গাড়িতে উঠে বসার পরে কি মনে করে সে বাইরে তাকালো। দোতলায় চোখ পড়ে গেলো। খুব চেনা একজন মানুষ সাদা পাঞ্জাবী পরে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে।

আসিফ কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রশীদ সাহেব টের পায়নি। কেউ কদমবুচি করছে দেখে তার সম্বিত ফিরলো।

- আব্বা তুমি এখানে?

- আমি এখানেই থাকি।

- কেন?

- সে অনেক কথা।

- আমার সাথে যাবে?

- তোমার একলা জীবনে ব্যাঘাত ঘটবে।

- অনেক থেকেছি একলা। আব্বা আমাকে যদি ক্ষমা করতে পারো তবে আমারই সাথে চলো।

- তোমার মায়ের কবর জিয়ারত করে যাই।

আসিফ বাবাকে জড়িয়ে ধরে শব্দ করে কেঁদে উঠলো। বৃদ্ধাশ্রমের লোকজন, সমাজসেবা অফিসের কর্তা ব্যক্তিরা সব তাজ্জব হয়ে গেছে। রশীদ সাহেব কখনো বলেননি তার ছেলে এত বড় একজন অফিসার।

- বাবা তুমি একদম কথা শোনো না। ঠিকই ঘাসে পা ডুবিয়ে বসলে।

- আরে কিচ্ছু হবে না। ঘাসের রস লাগাতে পারলে মনে অনেক শান্তি লাগে। মাটির স্পর্শ ছাড়া কি জীবন বাঁচে নাকি। এই যা পানির বোতল আনতে ভূলে গেছি।

- পানি খাবে। তুমি বসো। আমি এক দৌঁড়ে গিয়ে ওয়াটার বটল নিয়ে আসি।

ভালো লাগা উপাখ্যান

সজল! না, ছেলেটার চোখে কোন জল নেই। তবু তার নাম সজল আহমেদ। বাবা মায়ের রাখা নাম। আসলে তার নামটি রেখেছিলেন তার আম্মুর নানা। চোখে তার চাপা দ্যুতি। পৃথিবীটা যে আনন্দময় তা সজলের চোখ দেখলে বোঝা যায়। সদা হাস্যময় লাস্যময় এক যুবা। অতি সিরিয়াস সময়ে সে রসিকতা করে পরিবেশ হালকা করার ক্ষমতা রাখে। সজল খুলনার ছেলে। খুলনা টাউনের নয়। মেইন টাউন থেকে বেশ দূরের এক গ্রামে তার বেড়ে ওঠা। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছে। হলে থাকার কথা। কিন্তু সে থাকে মিরপুরে।

অনেকক্ষণ শাহবাগে দাঁড়িয়ে থাকার পরে একটা বাস পেলো। সিট নাই। সিট আছে, কিন্তু একটাও খালি নাই। পেছনে একটা সিট খালী হলো। কিন্তু পাশের দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি অতি দ্রুত শূণ্যস্থান পূর্ণ করে ফেলল। লোকটি ছোট খালে খুব সম্ভবত চেয়ার সিটিং খেলায় এলাকায় চ্যাম্পিয়ন হত। সজল বাসের রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুসময় পরে কয়েকব্যক্তির ঘাড় পেরিয়ে একটা ছেলের দিকে চোখ পড়ে গেলো। ছেলেটার ঠোঁট এবং নাকের গঠন অনন্য। একবার চোখ পড়লে আরেকবার সে ফিরে তাকাবেই। সজলও দ্বিতীয়বার চোখ তুলল। চোখাচোখি হয়ে গেলো। প্রথম প্রথম অন্য ছেলেদের চোখে চোখ রেখে তাকাতে সজল লজ্জা বোধ করত। ক্রমে ক্রমে সেটা এখন দূর হয়ে গেছে। এখন সে আর শরমিন্দা হয় না। সজল হালকা একটা হাসি দিলো। ছেলেটা চোখ ঘুরিয়ে সামনে তাকালো।

কৈশোরে সুন্দর মেয়েদের দূর থেকে দেখার মাঝে একটা আলাদা থ্রিল আছে। এ অনেকটা বাগানে ফোঁটা সেরা ফুলটা দেখার মত। ধরা বা ছোঁয়ার দরকার নেই। দূর থেকে জাস্ট তার সৌন্দর্য্য সুধা উপভোগ করা। তাদের চূড়ির রিনিঝিনি ঝংকার, কাপড়ের খসখস শব্দ এক অন্যরকম শিরশিরানী এনে দেয় বুকের ভিতর। এটা গেলো আর দশজন সাধারণ ছেলের কথা। সজলের কিন্তু অন্য কেস। সুদর্শন ছেলে দেখলে তার বুকের ভিতর শিরশিরে কাঁপন জাগে। দ্বিতীয়বার তাকাবার অদম্য বাসনা তাকে পেয়ে বসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে, ক্যান্টিনে, আমগাছের নিচে যখন বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়, দূরের কোন সুন্দরী অপ্সরীকে দেখে সবাই লোভনীয় মন্তব্য করে। সেও তাদের সাথে তাল দেয়। কিন্তু সে মুখ ফুঁটে বলতে পারে না ঐ অপ্সরীর সাথে থাকা ছেলেটাকে দেখে তার অনুভূতির কথা। এমন এক সমাজে, এমন এক দেশে জন্মেছে যেখানে সে নিজে থেকেই শিখেছে কোন কোন বিষয় গোপন রাখতে হবে। কেউ তাকে নিষেধ করেনি। কিন্তু সে জানে যখনি সে মুখ খুলবে তখনই ধর্ম , সমাজ, পরিবার তার মুখ চেপে ধরবে। সত্যি বলতে কি সজল এখনো জানেনা সে সমকামী কিনা।

কৈশোরে সে প্রথম এর স্বাদ পায় পাশের বাড়ীর ভাইয়ার কাছে। বাড়ীতে গেস্ট থাকায় সে ঘুমোতে গেছিলো পাশের বাড়ী। ভাইয়া তার থেকে বছর পাঁচেকের বড় ছিলো। সম্পূর্ণ অচেনা এক জগৎ তার সামনে হাজির হয়। ভালোলাগা মন্দলাগা তাকে কুরেকুরে খেতে থাকে। পাপবোধে সে কোন কিছুতেই মন বসাতে পারে না। মসজিদে বসে চুপি চুপি কাঁদে। আল্লাহর কাছে মাফ চায়। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে আদ, সামুদ, লুতের কওমের মানুষের মত শাস্তি দিয়ো না। আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো।

সজল সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে কিনা আমি বলতে পারব না। তবে সে সমকামিতার পথে পুরোপুরি ছেড়ে যেতে পারে নি। আবার ধরেও থাকেনি। আরো কয়েকবার সে ইচ্ছে অনিচ্ছায় গেছে ভাইয়ার বিছানায়। আর সুন্দর ছেলে দেখলে সে যে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তার মর্ম বুঝতে পেরেছে। এটাকে যে ক্রাশ খাওয়া বলে সেটা সে জানতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে। ক্রাশ সে বহুবার খেয়েছে। কারো ফিগার দেখে, কারো ঠোঁট দেখে, কারো চোখ দেখে কারোবা বাঁকা হাসি দেখে। কাছের বন্ধুরা কেউ কেউ খেয়াল করে দেখেছে। জিজ্ঞেস করেছে, কি দেখিস। সে মিথ্যা বলেছে। আমি মানুষের হাঁটা দেখি। খেঁয়াল করে দেখ। একেকটা মানুষের হাঁটার স্টাইল একেকরকম। কেউ দুলে হাঁটে, কেউ নাচের ছন্দে হাঁটে আবার কেউ পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে হাটে। হাঁটাকে একধরণের শিল্প বলা চলে। বন্ধু খেয়াল করে দেখে আরে আসলেই তো।

সজল মিরপুর দশে এসে নামে। এক কাপ চা খাওয়া গেলে মন্দ হবে না। সে মফিজ চাচার দোকানে গেলো। দোকান বলতে রাস্তার ফুটপাতের উপর কাঠের তৈরী অস্থায়ী দোকান। মফিজ মিয়ার বাড়ী নোয়াখালী। নোয়াখালীর মানুষ সবজায়গায় পাওয়া যায়। আমেরিকা, লন্ডন, মিডল ইস্ট, এমনকি চাঁদে গেলেও নোয়াখালীর লোক পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। মফিজ মিয়ার দোকানে কয়েক আইটেমের চা পাওয়া যায়। লাল চা, দুধ চা, আদা চা, লেবু চা। মফিজ মিয়া অবশ্য দুধ চা বলে না। বলে সাদা চা। লাল চা যখন আছে তখন সাদা চা ও থাকা উচিত। আর চায়ের নাম কেন

শুধু দুধের নামে হবে। চায়ে তো চিনিও থাকে। কেউ তো কখনো বলে না চিনি চা। মফিজ চাচার সাদা চায়ের মজাই আলাদা। এক কাপ খেলে আরেক কাপ খেতে মনে চায়। সজল চায়ের অর্ডার দিয়ে বেঞ্চে বসল। বেঞ্চের চার পায়ার কোন একটা ছোট আছে। নড়ছে। বসে আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। মফিজ মিয়ার পোষা কালো বিড়ালটা মফিজ মিয়ার ছোট ক্যাশ বাক্সের পাশে বসে আছে। সজলের চোখের দিকে বিড়ালটা তাকিয়ে আছে। একটা মজার কথা কি জানো বিড়ালের চোখে চোখ রেখে তাকালে সে খুব লজ্জা পায়। সে কিছুতেই তোমার চোখে চোখ রাখবে না। মুহূর্তেই চোখ ফিরিয়ে নেবে। মানুষ এরকম কুচকুচে কালো বিড়াল কেন পোষে! কালো বিড়াল নাকি ভূতের বাহন। কয়েকবছর আগে শোনা গিয়েছিলো কালো বিড়ালের মাথায় নাকি ম্যাগনেট থাকে। মহামূল্যবান সেই ম্যাগনেট নাকি চড়া দামে আমেরিকা কিনে নেয়। মফিজ চাচা ম্যাগনেটের লোভে কালো বিড়াল পুষেছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে সে শুধু হাসে।

চা শেষ করে সে ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকলো। ফুরফুরে বাতাস বইছে। ভালোই লাগছে। বাতাসে শীতের আমেজ। বাতাসটাকে ভালোভাবে উপভোগ করতে সে ওভারব্রিজের উপর গিয়ে দাঁড়ালো। বাতাসটা আসছে মিরপুর -১ এর দিকের রাস্তা ধরে। আজকাল বাতাসেরাও গাড়ীর মত রাস্তা ধরে চলাফেরা করে ঢাকা শহরে। রাস্তার বাইরে গেলে বড়বড় বিল্ডিং এ বাড়ী খেতে খেতে বাতাসেরা নাকাল হয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গাড়ীর এই প্যাপু শব্দ কান ঝালাপালা করে দেয়। যান্ত্রিক কোলাহলকে পাশ কাঁটিয়ে সে বাতাসের শীতলতা উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। বাতাস তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছিলো অন্য কোথাও। পথচারীর অন্যমনস্ক ধাক্কায় সে সম্বিত ফিরে পেলো। ধাক্কা দেয়া লোকটা মিষ্টি করে বলে স্যরি। সজল খেয়াল করল সেই ছেলেটা। বাসের ভিতর যাকে দেখে সাময়িক ক্রাশ খেয়েছিলো। ছেলেটা দেখতে আসলেই অওসাম। ফরসা। মাঝারী হাইট। কানে হেডফোন। ছেলেটা পাশে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকালো। আবার সামনে চোখ ফেরালো। ওভারব্রিজের রেলিং বেয়ে ছেলেটার হাত সজলের হাত স্পর্ষ করল। সজল পুলকিত হলো।

ছেলেটা নিশ্চয়ই তার মত কেউ। ছেলেটাকে স্মার্ট বলতেই হয়। চোখ দেখেই সে তার মনের কথা পরে ফেলতে পেরেছে। ছেলেটার চোখ রাডারকে হার মানিয়ে দেবে নিশ্চিত।

ছেলেটা কোন কথা বলছে না। সজলও কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। একসময় ছেলেটা কানের পাশে মুখ এনে বলল, ভাই যাবেন? সজল একটু টাশকি খেলো। সে নিশিকন্যাদের দেখেছে ঢাকা শহরের রাস্তায়। নিশিপুত্রদের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় ফেসবুকের পাতায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো ভূয়া থাকে। কারো সাথে সমস্যা হলে দেখা যায় একজন আরেকজনের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অমুক টাকা নিয়ে সেক্স করে। তার সাথে সেক্স করতে চাইলে এই নাম্বারে ফোন দাও ইত্যাদি। এগুলো আসলে অতি জঘন্য মানসিকতার কাজ। ফেসবুক যারা ব্যবহার করে তারা সবাই মোটামুটি শিক্ষিত। বেশিরভাগ উষ্চশিক্ষিত। শিক্ষিত মানুষেরা এই কাজগুলো কিভাবে করে সজল বুঝতে পারে না।

সজল কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, কত দিতে হবে? ছেলেটা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, একবার করলে ৫০০ টাকা , দুইবার করলে ৭০০ টাকা। ব্লোজব নিলে ২০০ টাকা। সজল জিজ্ঞেস করল, কি করো তুমি? ছেলেটা জিজ্ঞেস করলো, একবার সেক্স করতে কি এগুলা জানা আর্জেন্ট আপনার?

সজল আর কথা বাড়ালো না। ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে চলল। ছেলেটা এই হ্যালো বলে তাকে ডাক দিলো। সে পেছনে ফিরে তাকালো না। তার বুকের ভেতরের ভালোলাগাটা এখন বিমর্ষতায় পরিণত হলো। বুকের ভেতর একটা ফাঁকা অনুভূতি তৈরী হয়েছে। পৃথিবীর আর সব পথ কি ছেলেটার জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে? নাকি সে টাকা উপার্জনের সব থেকে সহজ পথটাকে বেছে নিয়েছে। খোদা তায়ালা তাকে রূপ দিয়েছে দেহ ভরে। আর ছেলেটা সেটাকেই পুজি করেছে। সজল তার ফ্লাটের দরজায় পৌঁছে গেছে। রোড লাইটের আলো পেরিয়ে অনেক দূরের

আকাশে তারার মেলা। তারা অবাক চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। আচ্ছা সজলের চোখে কি জল থাকা উচিত?

(বিঃদ্রঃ এটি আমার প্রথম লেখা গল্প)

দুর্বলা

সৌরভের শৈশব ছিলো আনন্দময়। সদ্য কৈশোরে এসে সে বড় দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে। তার গলার স্বর অপেক্ষাকৃত চিকন। ক্লাসের ছেলেরা তাকে সরাসরি হাফ লেডিস বলা শুরু করেছে। খুব লজ্জা লাগে। খুব খুব। চোখ ফেঁটে পানি চলে আসতে চায়। এই সেদিন ক্লাসের সবার মধ্যে তিন বেঞ্চ পেছনে বসা সাইফুল চিৎকার করে বললো "ওই হাফলেডিস তোর অংক খাতাটা দে দেখি।" অঙ্ক খাতা চাওয়া মুখ্য নয়, সৌরভকে হাফলেডিস বলাই ছিলো তার আসল উদ্দেশ্য। কি ক্ষতি করেছে সে সাইফুলের। তাকে হাফলেডিস বলার পরে দাঁত বের করে জান্তব হাসি হাসলো সাইফুল। তাতে কি ও খুব আনন্দ পেয়েছে। অন্যকে কষ্ট দিয়ে মানুষ কি এমন আনন্দ পায়।

সৌরভ কি করবে! সে ভাবে। ছোট বেলা থেকেই সে মেয়েদের সাথে খুব সহজে মিশতে পারে। ছেলেদের সাথে মিশতে বিব্রত লাগে। পাড়ার ছেলেরা যখন দলবেঁধে রাইস মিলের চাতালে খেলতে যেতো তখন সে মেয়েদের সাথে বাবলা তলায় নারিকেলের ঠুলা মালা নিয়ে ঘর সংসার খেলেছে। ঝগড়া বাঁধলে সেও চুল টানাটানি করেছে। কৈশোরে এসে সমবয়সী ছেলেরা যখন ক্রিকেট ফুটবল নিয়ে দাবড়ে বেড়াচ্ছে তখন সে নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছে। এই বুঝি কেউ তাকে হাফ লেডিস বলে খেপাতে শুরু করলো।

সবাই যে খেপায় এমন নয়। ক্লাসে দুয়েকজন আছে যারা অন্য সবার থেকে আলাদা। ওর সাথে মেশে। ওকে সংগ দেয়। তাদেরই একজন মনিরুজ্জামান। মনি একদিন বললো, “সৌরভ, আমার মনে হয় অন্যেরা তোকে খেপানোর জন্য এসব বলে। তুই খেপবি না। তাহলে দেখিস দুদিন পরে ওরা এসব বলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে”।

না সৌরভ আর খেপে না। কিন্তু অন্যদের আগ্রহ হারানোর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাদের পাশবিক উল্লাসের মাত্রা বাড়তেই থাকলো। কাজ নেই কথা নেই ঠাস করে পেছন থেকে সৌরভের পিছে থাপ্পড় মেরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সৌরভ ফুঁসে ওঠে। কিন্তু ওদের সংগে পেরে ওঠে না। বুলিংয়ের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাবে স্যারদের কাছে নালিশ করবে। খুব লজ্জা লাগবে এসব কথা স্যারদের বলতে।

একদিনের ঘটনা। ক্লাস সিক্সে পড়ে তখন। গরমের দিন। সৌরভ বাড়ির পাশে শিরিষ গাছের নিসে বসে বই পড়ছিলো। নিজ ইচ্ছায় পড়ছিলো এমন না। বাবা তাকে ওখানে বসে পড়তে বাধ্য করছিলো। ক্লাসের বদ একটা ছেলে এদিকের রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলো। হঠাৎ ওকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বললো, “ঐ মাইয়া এইটা তোগো বাড়ী”? সৌরভের দুচোখে যদি ভস্ম করে দেওয়ার শক্তি থাকতো সে তবে হতচ্ছড়াটাকে ভস্ম করে দিতো। মহাভারতের সিরিয়ালে যেমনটি দেখায়। সে কিছু বললো না। বিকাশ আবার চিৎকার করলো, “ঐ মাইয়া কথা কস না ক্যা!” আশেপাশের মানুষেরা শুনে কি ভাববে। সৌরভ বই খাতা ওখানেই ফেলে রেখে বাড়ির মধ্যে দৌড় দিলো।

স্কুল ছুটির ঘন্টা বেজে গেছে। ক্লাস সেভেনের সবাই ক্লাস ছেড়ে বেরোনোর জন্য ব্যাগ পত্তর গুছিয়ে নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করেছে। এমন সময়ে পেছন থেকে এসে নাইম সৌরভের বিশেষ স্থান

চেপে ধরলো। সৌরভ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। তার হতবিহ্বলতা কাটলো নাইমের উচ্চ চিৎকারে, "আছে রে আছে। মোটা জিনিস আছে। গর্ত না"। ক্লাসের মেয়েরা সব মুখ টিপে হাসতে লাগলো। সারা পথ সৌরভ কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরলো। বিকেলে প্রাইভেট পড়তে গেলো না। অন্যদিন বাড়িতে এসে ব্যাগ খাটের উপর ছুড়ে দিয়ে সে খেতে বসে। আজ সে খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো। জামা জুতো সেভাবেই পরা আছে।

মা কি কাজে ব্যস্ত ছিলো। ছেলেকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে এগিয়ে এলেন। কি হয়েছে সৌরভ?

- কিছু না।

- আমাকে বল। কেউ মেরেছে?

- না।

- তাহলে?

- আমাকে সবাই খেপায় মা। আমি কারো সাথে ঝগড়া করি না। তাও সবাই আমাকে এসে হাফ লেডিস বলে। আল্লা আমার ভয়েস এমন মেয়েদের মত করে দিয়েছে কেন মা!

- পাগল ছেলে। এই বয়সে সবারই ভয়েস এরকম একটু চিকন থাকে। দেখিস নাইন টেনে পড়ার সময়ে ভয়েস বদলে যাবে। আর তুই মন দিয়ে পড়াশোনা করিস। দেখবি সবাই তোকে খাতির করছে। নে ওঠ খেয়ে নিবি। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। ওঠ।

হ্যাঁ। সৌরভ মন দিয়ে পড়ছে। নাইন টেন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। ক্লাস এইটের মাঝামাঝি এসে সৌরভের ভয়েস ভাঙতে শুরু করলো। ক্লাসে ফার্স্ট বয় হয়। অন্যকে ম্যাথ দেখিয়ে দেয়। অনেকেই খাতির করে। এখনো ক্রিকেট ফুটবল খেলার আগ্রহ পায় না সে। মালিঙ্গা আফ্রিদিদের ইতিহাস ভূগোল নিয়ে কথার তুবড়ি ছোটাতে পারে না বটে কিন্তু সেও কম যায় না। সুযোগ পেলে

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ফেঁদে বসে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মেম্বার সে। প্রতি সপ্তাহে একটা করে বই নিয়ে আসে। জুল ভার্নের গল্পের চরিত্রের সাথে সাথে সেও ঘুরে আসে দেশ থেকে দেশান্তরে। সাগর থেকে মহাসাগরে। অবসর সময়ে বাড়ির বাগানে বসে ফুল গাছ, শিম গাছ গুলোকে দেখাশুনো করে। পানি দেয়, আগাছা নিড়ায়, বিকেল গড়ায়, সন্ধ্যা নামে, বয়স বাড়ে।

সময় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। গলার ভয়েস বদলে গেছে। একটু টেনে টেনে কথার বলার অভ্যেষ রয়ে গেছে। অনেক চেষ্টা করেও এটা সে ছাড়তে পারেনি। আর এটুকুই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে ফেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অফপিরিয়ডে একদিন আনিসের সাথে সৌরভের তর্ক বেঁধে গেলো। কেমিস্ট্রির কোন সূত্র নিয়ে। দুজন দুজনের যুক্তিতে অনড়। সৌরভ যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে এনেছে এমনি সময়ে আনিস বলে উঠলো, "ঐ হাফলেডিস, মেয়েদের মত প্যাঁচাস নাতো। থাম"। সৌরভ চুপসে যায়। সৌরভের গল্প কখনো শেষ হবে না। জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে সৌরভের গল্প। হাজারো সৌরভ ঘরের কোনে একাকি মন ভার করে বসে থাকে। তাতে আনিসদের কি আসে যায়!

(সমাপ্ত)